মিথ্যার আবরণে
দিল্লী আগ্রা ফতেপুর সিক্রি

ডক্টর রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী
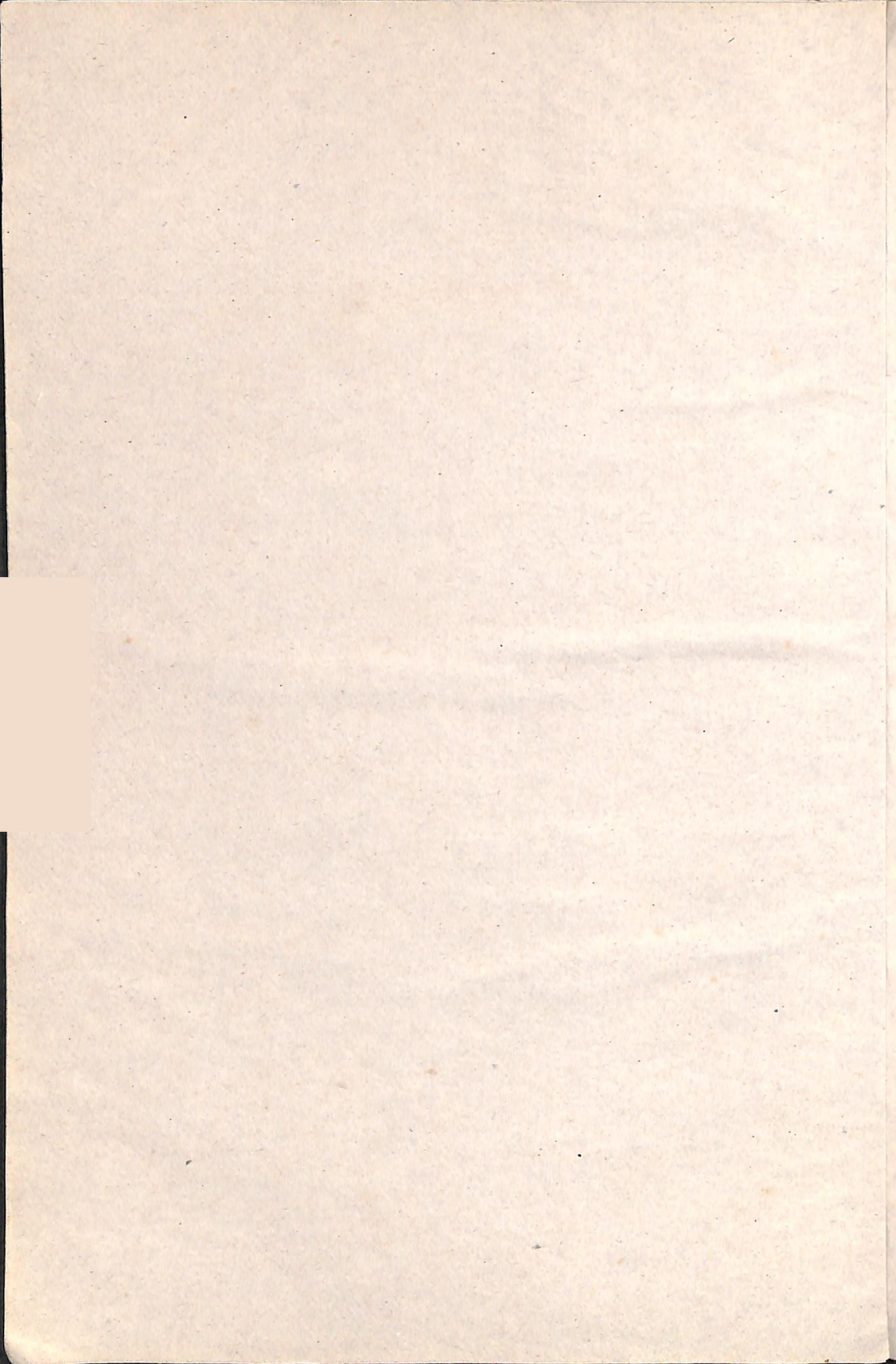
মিথ্যার আবরণে
দিল্লী-আগ্রা-ফতেপুর সিক্রি

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

গ্রন্থরশ্মি ঃ ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

Mithyar Abarane Dilli-Agra-Fatepur Sikri
By Dr. Radheshyam Brahmachari
A critical discussion on distortion of medaeval Indian History.
Price Rs. Forty Five only

প্রকাশক ঃ
গ্রন্থরশ্মির পক্ষে শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার
২০৬ বিধান সরণী,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন-২১৯-৩১২৪

প্রথম প্রকাশ ঃ জন্মাষ্টমী, ১৪০৭
২৩শে আগস্ট, ২০০০
পুর্নমুদ্রণঃ অক্টোবর ২০০১
প্রচ্ছদ ঃ প্রণবকুমার হাজরা

মূল্য ঃ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র

অক্ষরবিন্যাস ঃ পাল প্রিন্টার্স
৬৬বি, মানিকতলা স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রণে ঃ লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

যে সব অগণিত হিন্দু বীর নৃশংস মুসলমান আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, যাঁদের আত্মদানের ফলে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা পেয়েছে এবং অগণিত যেই সব মা-বোন যাঁরা মুসলমানদের হাত থেকে আত্মসম্মান রক্ষার্থে জ্বলন্ত আগুনে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থ নিবেদিত হল।

—লেখক।

এই লেখকের ঃ

- পুরুষার্থ প্রসঙ্গ ঃ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা ৩০৲
- ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ঃ এবার ঘরে ফেরার পালা ১০০৲
- ভারতীয় ঐতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা ৫৲
- কল্যাব্দ ঃ সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক হিন্দুকাল গণনা পদ্ধতি ৫৲
- মার্কস ও মার্কসবাদীদের অজ্ঞতা ১২৲

মুসলীম পরাধীনতার বিরুদ্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিংহনাদ

নগরিয়া লোকে যবে প্রভু আজ্ঞা দিলা।
ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলা।।
মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্ত্তন মহাধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি।।
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হইল সকল যবন।
কাজী পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন।।
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল।।
এতকাল প্রকটে না কেহ কৈল হিন্দুয়ানি।
এবে যে উদ্যম চালাও কার বল জানি।।
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছোঁ ঘরে।।
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু।।
এত বলি কাজী গেল নগরিয়া লোক।
প্রভু স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক।।
প্রভু আজ্ঞা দিল যাই করহ কীর্ত্তন।
মুঞি সংহারিমু আজি সকল যবন।।
তা সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি।।
নগরে নগরে আজি করিমু কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন।।
সন্ধ্যাতে দিউটি সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখ কোন কাজী আসি মোরে মানা করে।।
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায়।।
এই মত কীর্ত্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রভু কাজী দ্বারে গেলা।।
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি না হয় বাহিরে।।
উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন।।

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১৭শ পরিচ্ছেদ

ইসলাম সম্পর্কে কয়েকজন মনীষীর মন্তব্য

ইসলামের অনুসরণকারীদের হাতে অনেক পীড়ন ও নির্যাতন সহ্য করিয়াও, এমন কি প্রাণনাশের ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও এই সব দৈববিধানে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ সমাজের লোকেরা তাঁদের ধর্মমত বর্জন করেন নাই।

অন্যদিকে ইসলামধর্মীরা কোরানের দুইটি আয়াত, "পৌত্তলিকদের যেখানেই পাও হত্যা কর" এবং "অতঃপর ধর্মযুদ্ধে তাহাদের বন্দী করিয়া হয় বশ্যতার অঙ্গীকার নতুবা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়িয়া দাও"-অনুযায়ী ঈশ্বরের দোহাই দিয়া বলে যে, বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী পৌত্তলিকদের হত্যা বা নির্যাতন করা ঈশ্বরের নির্দেশ এবং আবশ্যিক। সুতরাং ইসলামধর্মীদের ধর্মীয় উন্মাদনা এবং ঈশ্বরের নির্দেশ পালনে তাহাদের অত্যুৎসাহিতা.... সেই পৌত্তলিকগণকে হত্যা ও নির্যাতন করিতে একালে বা সেকালে কখনই বিরত হয় নাই।

—**রাজা রামমোহন রায়,** (তুহফাৎ-উল-মওয়াহিদ্দীন)।

হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে (বৃটিশ) অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব শুধু হিন্দুরই। মুসলমানরা মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে—এ দেশে তাহাদের চিত্ত নাই।

—**শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,** (বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা)।

এবং জগৎসুদ্ধ লোক মিলিয়া মুসলমানের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ইহাদের কোন দিন চোখ খুলিবে কি না সন্দেহ।

—**শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,** (ঐ)

—মুসলমানরা এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন। তাহাদের মূল মন্ত্রঃ আল্লা এক এবং মহম্মদই একমাত্র রসুল। যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত সে সমস্ত কেবল খারাপ তাহাই নহে, উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হইবে; যে কোন পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হইবে; যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে; যে কোন গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচারিত হইয়াছে সেগুলি দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচ শত বছর ধরিয়া পৃথিবীতে রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম।

—**স্বামী বিবেকানন্দ, রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৫।**

আরবের পয়গম্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম যে পরিমাণ দ্বৈতবাদকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা অন্য কোন ধর্মে দেখিতে পাওয়া যায় নাই, এবং এমন অন্য কোন ধর্ম পাওয়া যায় নাই যাহাতে এই পরিমাণ রক্ত ক্ষরিত হইয়াছে ও যাহা অপরের প্রতি এত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছে। কোরানের মতে যে ব্যক্তি উহার শিক্ষাতে অবিশ্বাসী সে নিধনযোগ্য এবং তাহাকে হত্যা করার অর্থ তাহাকে দয়া প্রদর্শন। অপরূপ পরীতে পরিপূর্ণ ও সর্ববিধ ইন্দ্রিয় সুখের আগার বেহেস্তে পৌঁছিবার নিশ্চিততম পন্থা এই কাফেরদিগের নিধন।

—**স্বামী বিবেকানন্দ, প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত (৪র্থ ভাগ)**

সূচী

লেখকের কথা

অতীতের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যৎ সমস্যার ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার মধ্যেই ইতিহাসপাঠের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে। তাই অতীতের সেই ইতিহাস যদি বিকৃত, ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয় তবে ভবিষ্যতের পদক্ষেপও যে ত্রুটিযুক্ত হবে তা বলাই বাহুল্য। সেই কারণে নিজ দেশ ও জাতির নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস প্রতিটি মানুষেরই জানা অবশ্য কর্তব্য। এটা তার জন্মগত অধিকারও বটে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই যে, বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষই এই অধিকার থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত হয়ে চলেছেন। খ্রীস্টানীকরণের পর ইয়োরোপের পূর্ব ইতিহাস পরিকল্পিতভাবে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। ফলে আজকের ইয়োরোপের কোন ব্যক্তির পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে, খ্রীস্টধর্মের আগমনের পূর্বে তার ধর্ম কি ছিল, সংস্কৃতি কি ছিল। তেমনি ইসলামীকরণের পর ইরান, ইরাক, মিশর প্রভৃতি সুসভ্য দেশের ইতিহাস নির্মমভাবে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। ফলে মিশর বা ইরাকের মত দেশগুলোর সু-উন্নত সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস চিরতরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তাই আজ কোন মিশরবাসীর পক্ষে তার প্রাক্-ইসলামী সু-উন্নত সভ্যতার ইতিহাস জানা সম্ভব নয় বা ইরাকের কোন ব্যক্তির পক্ষে তার প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সভ্যতার ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। তেমনি বৃটিশরা আমেরিকায় বসতি করার পর সেখানকার সুসভ্য মায়া, আজটেক ইত্যাদি জাতির ইতিহাসকেও ধ্বংস করে ফেলেছে, ফলে সেই সব ইতিহাসও চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

তবে সুখের কথা হল, বিদেশী মুসলমান আক্রমণকারীদের পক্ষে ভারতে সম্পূর্ণ ইসলামীকরণ সম্ভব হয়নি, তাই ভারতের প্রাক্-ইসলামী ইতিহাস রক্ষা পেয়ে গেছে। মুসলমানরা তাদের ব্যাপক ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়ে ভারতের ইতিহাসে অনেক অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছে, ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে তারা লুপ্ত করেছে ঠিকই, তবে সমগ্র ইতিহাসকে লোপাট করতে পারেনি। তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, উজ্জয়িনী ইত্যাদি শিক্ষার পীঠস্থানগুলিকে ধ্বংস করার ফলে অনেক মূল্যবান পুঁথি তারা জ্বালিয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। কথিত আছে যে, সংস্কৃত পুঁথি জ্বালিয়ে সম্রাট ঔরঙজেবের স্নানের জল গরম করা হত। এই সব বর্বরোচিত ধ্বংসলীলার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখার সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের বহু প্রামাণ্য গ্রন্থও চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছে যার কোন পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়।

পরবর্তীকালে বৃটিশ পরাধীনতার যুগে ইংরেজরা মুসলমানদের মত গ্রন্থ জ্বালায়নি বা পাঠাগার ধ্বংস করেনি ঠিকই, কিন্তু তারা সুকৌশলে ভারতের সমগ্র ইতিহাসকেই বিকৃত করে দিয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অবদান হল, 'আর্যরা বহিরাগত' এই অলীক তত্ত্বের আমদানি। বৃটিশের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দুদের সকল প্রকারে অবদমিত ও হীনম্মন্য করে রাখা, যাতে তারা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে সাহস না পায়। প্রথমে 'আর্যরা বহিরাগত' এই তত্ত্বের দ্বারা হিন্দুর জাতীয় চেতনা ও প্রেরণার মূল উৎসমুখকেই স্তব্ধ করে দেওয়া হল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষকে একটা মালিকহীন দেশ বা no man's land-এ পর্যবসিত করে বৃটিশের ভারত শাসন করার নৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচার শুরু হল যে, শৌর্যবীর্য বলে কোন পদার্থ হিন্দুদের মধ্যে নেই। তাদের মধ্যে না আছে কোন জাতীয় চেতনা, না আছে কোন জাতীয় ঐক্য। তাই তারা বার বার বিদেশী আক্রমণকারীদের কাছে পরাস্ত হয়েছে, পরাধীন হয়েছে। অপর দিকে হিন্দুর যা কিছু গৌরবের তাকে অনৈতিহাসিক, অবাস্তব ও পৌরাণিক গল্প আখ্যা দেওয়া হল এবং কালক্রমে এই ধারাকে অনুসরণ করেই মুসলীম পরাধীনতার যুগের ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করার কাজ শুরু হল। বিদেশী হানাদার বর্বর মুসলমান দস্যুদের মহান প্রতিপন্ন করার এবং পরাজিত হিন্দুদের দুর্বল ও কাপুরুষ প্রতিপন্ন করার এক সর্বব্যাপী চক্রান্তের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। এভাবেই মধ্যযুগীয় ভারতের মুসলমান পরাধীনতার ইতিহাস লেখার মূল দিক্‌নির্দেশ স্থির হয়ে গেল।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে তৎকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও উক্ত বিকৃত দিক্‌-নির্দেশকেই সমর্থন করতে শুরু করলেন। কংগ্রেসের এই আচরণের পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত গান্ধী, জওহরলাল ইত্যাদি নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, ভারতবর্ষ একটি 'মিশ্র সংস্কৃতি'র দেশ এবং সেই কারণে ভারতের জাতীয়তাবাদের চরিত্রও মিশ্র। এখানে হিন্দু সংস্কৃতির বিশেষ কোন স্থান বা প্রাধান্য নেই। বৌদ্ধ, জৈন ও ইসলামী সংস্কৃতির মত হিন্দু সংস্কৃতিও ঐ মিশ্র সংস্কৃতির একটা অঙ্গ মাত্র।

এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে তাঁরা দেশকে এক চরম ভ্রান্ত পথে চালিত করলেন। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু সংস্কৃতি আর ভারতীয় সংস্কৃতি যে অভিন্ন, হিন্দু সংস্কৃতি লুপ্ত হলে ভারতীয় সংস্কৃতি বলে যে কিছু আর থাকবে না, এই ধ্রুব সত্যকে তাঁরা, নিজেদের অজ্ঞতার জন্যই হোক আর রাজনৈতিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যেই হোক, বর্জন করলেন এবং ভারতবর্ষকে এক ভ্রান্ত পথে

চালিত করার চেষ্টা করলেন। হিন্দুত্বই যে ভারতের জাতীয়তাবাদ, এই মূলসত্যকে অস্বীকার করে হিন্দু জাতির জাতীয় চেতনাকে সমূলে ধ্বংস করার এক উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, 'আর্যরা বহিরাগত', এই বৃটিশ তত্ত্বই আমাদের নেতাদের উপরিউক্ত পথে চালিত করেছে। আজকের হিন্দু নামধারী আর্যরাও এককালে বাইরে থেকে ভারতে এসেছে এবং আজকের মুসলমানরাও তাই। কাজেই এই দেশের উপর কারও কোন বিশেষ অধিকার নেই। এটা যেমন হিন্দুর দেশ, তেমন এটা মুসলমানেরও দেশ। এই দেশের উপর হিন্দু ও মুসলমানের সমান অধিকার। কাজেই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতিই ভারতীয় সংস্কৃতি এবং হিন্দুমুসলমানের মিলিত জাতীয়তাবাদই ভারতের জাতীয়তাবাদ।

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নেহরু ও গান্ধীর মত নেতারা বিদেশী বৃটিশদের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। বৃটিশরা এতদিন শিখিয়ে এসেছে যে তারা ভারতে আসার আগে ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে কোন জাতীয়তাবোধ ছিল না। তারা তখন সর্বদাই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল। বৃটিশরা ভারতে এসে রেল লাইন বসিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার পরই ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়। কাজেই এর ফলে যে জাতীয়তাবাদ জন্মলাভ করল তার চরিত্র মিশ্র। হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান বৌদ্ধ জৈন সবাইকে নিয়েই এই জাতীয়তাবাদ।

কিন্তু বৃটিশ আসার আগে ভারতীয়দের মধ্যে কোন জাতীয়তাবোধ ছিল না, এই তত্ত্ব ঋষি অরবিন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের মত মনীষীরা স্বীকার করলেন না। তাঁদের মতে হিন্দুরা বহিরাগত নয়, তাঁরা ভারতেরই মূল অধিবাসী। উপরন্তু বৈদিক বা হিন্দু সংস্কৃতিই এই বিশাল দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন জাতি-উপজাতিতে বিভক্ত বিশাল জনগোষ্ঠীকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী এবং গান্ধার থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত এই বিশাল ভূভাগে বিবিধের মধ্যে যে মিলন আমরা লক্ষ্য করে থাকি, হিন্দু সংস্কৃতিই হল সেই মহামিলনের মূল ভিত্তি। গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী ও গোবিন্দ, এই চার 'গ'-এর হিন্দু সংস্কৃতিই এই মহামিলনের সেতু স্বরূপ। তাই এই মনীষীরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, হিন্দু সংস্কৃতিই ভারতীয় সংস্কৃতি, হিন্দুত্বই ভারতীয়ত্ব এবং হিন্দুত্বই ভারতের জাতীয়তাবাদ।।

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে লিখলেন, "মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোন বিশেষ ধর্ম নহে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক জাতিগত পরিণাম।" শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিখ্যাত 'উত্তরপাড়া অভিভাষণে' বললেন, "I say that is the Sanatana Dharma which

is our nationalism. This Hindu nation was born with the Sanatana Dharma, with it it moves and with it it grows.''—অর্থাৎ "সনাতন ধর্ম (বা হিন্দু বৈদিক ধর্ম)-ই হল আমাদের জাতীয়তাবাদ। এই হিন্দু জাতি সনাতন ধর্মকে সাথে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এবং সনাতন ধর্মকে অবলম্বন করেই সে অগ্রসর হচ্ছে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে।" কিন্তু গান্ধী ও নেহরুর মত নেতারা এই সব সত্য-দ্রষ্টা ঋষিদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিত এই সব নেতারা যে বৃটিশ দ্বারা উদ্ভাবিত 'মিশ্র জাতীয়তাবাদ'-এর উদ্ভট তত্ত্বকেই মূল তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি?

উপরিউক্ত মিশ্র জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করার পিছনে বিশেষ একটি রাজনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল। কংগ্রেসের নেতারা ভেবেছিলেন যে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সফল স্বাধীনতা আন্দোলন করতে হলে, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীস্টান সবাইকে নিয়েই সেই আন্দোলন করতে হবে বা সবাইকেই সেই আন্দোলনে সামিল করতে হবে। যেহেতু জনগোষ্ঠী হিসাবে হিন্দু এবং মুসলমানরা হল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত নীতির অর্থ দাঁড়াল এই যে, হিন্দু ও মুসলমানকে সমানভাবে এই স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশীদার করতে হবে। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, মুসলমানদের কাছে দেশ বড় নয়, বড় হল ইসলাম। তাই তারা কংগ্রেসকে সরাসরি একটা হিন্দুর রাজনৈতিক দল বলে মত প্রকাশ করতে শুরু করল এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করল।

এর পিছনে অবশ্য আরও একটা কারণ ছিল। অল্প কিছুদিন আগেও মুসলমানরা ছিল শাসক এবং হিন্দুরা ছিল অধীনস্থ প্রজা বা জিম্মী। কাজেই সেই জিম্মীদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়াকে মুসলমানরা সম্মানহানিকর বলে মনে করল। এর থেকেই জন্ম নিল মুসলমান তোষামোদের বর্তমান ধারা। তোষামোদ করে তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল করতে হবে এবং কংগ্রেসের সমর্থক বানাতে হবে। তোষণের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের প্রতি তাদের সহানুভূতিশীল করে তুলতে হবে। ১৯২০ সালে খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের মুসলমান তোষণের নীতি ময়দানে নেমে পড়ল।

ক্রমে ভোটের রাজনীতি এই মুসলমান তোষণের ধারায় এক নতুন মাত্রা যোগ করল। দেখা গেল মুসলমানরা তাদের ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী ভোট দেয় না, তারা ভোট দেয় ধর্মীয় মোল্লা বা ইমামদের নির্দেশে দলবদ্ধ ভাবে। এই দলবদ্ধ ভোট আদায় করার লালসা রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষিপ্ত করে তুলল। ফলে দেশজুড়ে মুসলমান তোষণের এক বন্যা বইতে শুরু করে দিল এবং কংগ্রেস হয়ে উঠল নির্লজ্জ মুসলীম তোষণের সর্বপ্রধান প্রবক্তা।

সব থেকে দুঃখের বিষয় হল এই যে, মুসলমান তোষণের এই রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা নগ্নভাবে আক্রান্ত হল মুসলীম পরাধীনতার যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস। বিদেশী বৃটিশ শক্তি ভারতের ইতিহাস-বিকৃতির যে শিলান্যাস করেছিল, স্বাধীন ভারতের রাজনীতিকদের মুসলমান তোষণের নীতির ফলে তা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করল।

উক্ত ইতিহাস-বিকৃতির সর্বপ্রথম সিদ্ধান্ত হল, ভারতের ইতিহাসের মুসলমান শাসনের যুগ পরাধীনতার যুগ নয়। এই সিদ্ধান্ত যে কতখানি অবাস্তব ও অযৌক্তিক তা বোঝাতে শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখছেন, "বর্তমান যুগে এক সম্প্রদায়ের হিন্দু প্রচার করিয়াছেন যে, ইংরাজ শাসনের পূর্বে ভারত কখনও পরাধীন হয় নাই, কারণ মুসলমানরা এদেশেই বসবাস করিত। এ যুক্তির অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, অস্ট্রেলিয়ার 'মাওরী' জাতি এবং আমেরিকার 'রেড ইণ্ডিয়ান' জাতি, অর্থাৎ আদিম অধিবাসীরা ধ্বংস হইয়াছে বটে কিন্তু কখনও পরাধীন হয় নাই, কারণ ইংরেজ শাসকরা তাহাদের দেশেই বাস করিত।" কিন্তু মুসলমান তোষণের খাতিরে ইতিহাস বইগুলোতে লেখা হতে থাকল, মুসলমান শাসনের যুগ পরাধীনতার যুগ তো নয়ই, বরং তা ভারতের ইতিহাসের সুবর্ণ যুগ।

পরবর্তী সিদ্ধান্ত হল, 'ইসলাম' শব্দের অর্থ 'শান্তি' বলতে হবে। 'ইসলাম' শব্দের প্রকৃত অর্থ যে 'আত্মসমর্পণ' তা বলা চলবে না। উপরন্তু ইসলামকে দেখাতে হবে উদার ও পরমতসহিষ্ণু এক মহান ধর্ম হিসাবে এবং কোরানকে দেখাতে হবে এক মহান সাম্যবাদী, জাতপাতের বিরোধী এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভাবে পরিপূর্ণ এক মহান গ্রন্থ হিসাবে। ইসলাম যে মনুষ্য সমাজকে মুসলমান ও কাফের এই দুই দলে ভাগ করে এবং ইসলামের উদ্দেশ্য যে জেহাদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে কাফেরশূন্য করে সমস্ত পৃথিবীতে আল্লার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা তা বলা যাবে না। কোরান মতে যে প্রতিটি কাফের 'অত্যন্ত ঘৃণিত ও বধযোগ্য তা বলা যাবে না। কোরান যে কাফের হত্যা করে সেই কাফেরের সমুদায় সম্পত্তি ভোগ দখল করতে নির্দেশ দেয় তা বলা যাবে না। কোরানের প্রতি পাতায় যে কাফের হত্যা করার, সমস্ত কাফের রমণীদের লুটের মাল হিসাবে গণ্য করার এবং কাফের নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস হিসাবে বেচে দেবার নির্দেশ আছে তা বলা যাবে না। ইসলামী তত্ত্ব যে কোন একজন সভ্য মানুষকে একটি অসভ্য বর্বর ঘাতকে পরিণত করতে সক্ষম তা বলা যাবে না।

কোরান বলছে, যারা মহম্মদের নবীত্বে বিশ্বাস করে না তারা কাফের এবং পশুর সমান (৭/১৭৯); এরা সবাই নরকে যাবে (৩/৮৫); এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না (৫/৫৭); আল্লা এদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন (৪/১৪৭-১৪৮, ৮/১০-১৪); এরা নিষ্ঠুরভাবে বধযোগ্য (৩৯/৩০-৩২); এদের যেখানে পাবে বন্দী করবে এবং হত্যা করবে (৪/৮৯, ৪/৯১,

২/১৯১); এদের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ কর, এদের গর্দানে আঘাত কর (৮/৩৯, ৪৭/৪); ওদের শূলবিদ্ধ কর অথবা হাত-পা কেটে দাও (৫/৩৩) ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিধর্মী কাফেরদের প্রতি আল্লা কতখানি নৃশংস হতে পারেন, দু-একটা উদাহরণ দিলে তা বুঝতে সুবিধা হবে। কোরানের ৯ম সুরার ৫ম আয়াতে আল্লা বলছেন—"অতঃপর নিষিদ্ধ মাসসমূহ শেষ হলে অংশীবাদী কাফেরদের যেখানে পাবে বধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা (অনুতাপ) করে, নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয় তবে তাদের মুক্ত করে দেবে।" চতুর্থ সুরার ৫৬ষ্ঠ আয়াতে আল্লা বলছেন—"যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস না করে তাদের আমি অবশ্যই জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ করবো এবং প্রত্যেকবার দগ্ধ করার পর নতুন চামড়ার সৃষ্টি করবো, যাতে তারা নিরন্তর শাস্তি ভোগ করতে পারে।" পঞ্চম সুরার ৩৩শ আয়াতে আল্লা বলছেন—"যারা আল্লা ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি উৎপাদন করে, নিশ্চয়ই তাদের শাস্তি হল—তাদের হত্যা কর, কিংবা শূলবিদ্ধ কর, কিংবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেল, কিংবা তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার কর।" কাজেই আল্লা নিজেই যখন কাফেরদের প্রতি এত নৃশংস নির্মম, তখন তাঁর বান্দারাও তাদের প্রতি নির্মম নৃশংস হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! আল্লা যেহেতু কাফেরদের ঘৃণা করেন, তাঁর বান্দারাও তাদের ঘৃণা করবে এটাই স্বাভাবিক। উপরন্তু যেই সব বান্দা কাফের-নিধন করবে তারা হবে 'গাজী'। স্বর্গে এই গাজীরা হবে বিশেষ সম্মানিত অতিথি। আল্লা তাদের বিশেষভাবে আপ্যায়িত করবেন এবং স্বর্গের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠস্থানে তাদের থাকার ব্যবস্থা করবেন। কাজেই কাফের হত্যা করে গাজী হওয়া প্রতিটি মুসলমানের কাছে পরম কাম্য ও পবিত্র কর্তব্য।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ইসলামের এই চূড়ান্ত অমানবিক তত্ত্ব আরবের নিরক্ষর ও নৃশংস পশুপালক বেদুইনদের হাতে বা ইরাক বা তুরস্কের নৃশংস পশুপালকদের হাতে পড়লে তার কি পরিণতি হতে পারে। বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, ইসলামের ঘৃণার তত্ত্বে, এবং কাফের নির্মূল করার তত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐ সব বর্বর লোকেরা ইসলামের উন্মুক্ত তরবারি (সৈফুদ্দিন) হাতে নিয়ে ভারতে ঢুকে কি বর্বরতার অনুষ্ঠান করতে পারে। অষ্টম শতাব্দীতে (৭১১ খ্রীঃ) মহম্মদ-বিন-কাসেমের সিন্ধুদেশ আক্রমণের মধ্য দিয়ে ভারতের মাটিতে এই সীমাহীন বর্বরতার সূত্রপাত হয়। এর প্রায় ৩০০ বছর পরে গজনীর সুলতান মামুদের ভারত লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে সেই বিভীষিকাময় বর্বরতার পুনরনুষ্ঠান শুরু হয়, যা পরবর্তী ৭০০ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। ১১৯২ সালে তরাইনের যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করলে উত্তর ভারতের এক বিশাল অংশে

মুসলমানদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। এইভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা মুসলমানদের হস্তগত হবার ফলে ইসলামী বর্বরতা কোন্ বীভৎস পর্যায়ে পৌছুতে পারে তা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়।

সেই মুসলমানরা ভারতের শাসক হয়ে বসল, যাদের কাছে কাফের হিন্দুর জীবনের কোন মূল্যই নেই। কোরান বলছে, "কাফেররা পশুর সমান; তাদের যেখানে পাবে হত্যা করবে।" এবং সেই মুসলমান শাসকরাও কোরানের নির্দেশকে কার্যে পরিণত করতে থাকল। তাদের কাছে হিন্দু কেটে উজাড় করা ঘাস কেটে জঙ্গল সাফ করারই সামিল। মুসলমান শাসকরা হল মুসলমানের রক্ষক আর হিন্দুর ভক্ষক। এক দিনের মধ্যে লক্ষ হিন্দু কেটে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া কোন বিচিত্র ব্যাপার থাকল না।

১৩৬০ সালে ফিরোজ শাহ তুঘলক উড়িষ্যা অভিযান করে এবং পুরীর জগন্নাথের বিগ্রহ নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেয়। ফেরার সময় জাজনগরে এসে শুনতে পেল যে সেখানকার লোকেরা ভয়ের চোটে সমুদ্রের একটা দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। ফিরোজ শাহ সৈন্য নিয়ে সেই দ্বীপে গেল এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার হিন্দুকে ১ দিনের মধ্যে কেটে উজাড় করল। সেই কসাই ফিরোজ শাহের নামে আজও দিল্লীতে একটা ক্রিকেট খেলার স্টেডিয়াম বিদ্যমান। এর থেকে লজ্জার কথা আর কি হতে পারে! মহম্মদ ঘোরী দিল্লী দখল করার পর বেনারস অভিযান করে। অসনি দুর্গ দখল করার পর মুসলমানরা নির্বিচারে নিরীহ নিরস্ত্র হিন্দুহত্যা করতে করতে বেনারসে পৌছায় এবং সেখানেও নির্বিচারে নরহত্যা চলতে থাকে। মুসলমান ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা করে লিখছেন—"Slaughter of Hindus was immense, none were spared except women and children."

সুলতান নাসিরুদ্দিনের সেনাপতি উলুঘ খাঁ হিমালয়ের পাদদেশে গাড়োয়াল অঞ্চলে যায়। সেখানে সে তার সৈন্যদের হুকুম দেয়, যে একটা জ্যান্ত কাফের ধরে আনতে পারবে সে দু টাকা, আর যে কাফেরের একটা কাটা মুণ্ড আনতে পারবে সে একটাকা পাবে। ক্ষুধার্ত কুকুরের মত মুসলমান সৈন্যরা কাফেরের খোঁজে চতুর্দিকে বেরিয়ে পড়ে। দীর্ঘ ২০ দিন ধরে সেই হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। কাটা মানুষের মুণ্ড ও কবন্ধের স্তূপ পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে যায়। খানুয়ার যুদ্ধে রাজপুত বাহিনী পরাজিত হলে বাবর গণহত্যার আদেশ দেন। মুহম্মদী ও বাবরের অন্য সেনাপতিরা লক্ষ লক্ষ হিন্দু কেটে ফতেপুর সিক্রীতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়, মৃত মানুষের কাটা মুণ্ড দিয়ে পাহাড় তৈরি করা হয়। সুদীর্ঘ ৭০০ বছর এই হত্যালীলা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে এবং স্বামীজির হিসাব মত এই ৭০০ বছরে মুসলমানরা হিন্দুর সংখ্যা ৬০ কোটি থেকে ২০ কোটিতে নামিয়ে আনে।

সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু রমণীর মান-সম্মান বলতেও আর কিছু অবশিষ্ট থাকল না। লক্ষ লক্ষ হিন্দু নারী ও শিশুকে ক্রীতদাস হিসাবে কাবুল, কান্দাহার, গজনী, বাগদাদ, এমনকি সুদূর দামাস্কাসে নিয়ে গিয়ে সেখানকার ক্রীতদাসের

হাটে বিক্রী করা হতে থাকল। সুন্দরী হিন্দু রমণীরা মুসলমানদের লালসার শিকারে পরিণত হতে থাকল। আগে হিন্দু সমাজের মেয়েরা ঘোমটা কাকে বলে জানত না। মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই হিন্দু রমণীদের মধ্যে ঘোমটার প্রচলন শুরু হয়। শুধু তাই নয়, তাদের ঘরে বন্দী করে রাখা এবং অল্প বয়সে পাত্রস্থ করার রীতি চালু হয়।

অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে, বাংলা তথা উত্তর ভারতে হিন্দু মেয়েদের কেন রাতের অন্ধকারে বিবাহ দেওয়া হয়। কোন বৈদিক যজ্ঞই রাত্রে করার নিয়ম নেই। দিনের আলো থাকতে থাকতেই যজ্ঞ শেষ করার বিধি। তা সত্ত্বেও উত্তর ভারতে বিবাহের যজ্ঞ কেন রাতে করা হয়? রাতের অন্ধকারে কুমারী কন্যাকে পাত্রস্থ করে মুসলমানদের অগোচরে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দেবার জন্যই এই বিধি প্রচলিত হয়। পক্ষান্তরে দাক্ষিণাত্যে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ অনেক কম হবার জন্য আজও দিনের আলোতেই সেখানে বিবাহ অনুষ্ঠান ও যজ্ঞ সম্পন্ন করা হয়।

মুসলমান শাসকরা তো বটেই, তাদের অনুচরগণ এবং স্থানীয় প্রভাবশালী মুসলমানরা গুপ্তচর বা 'সিন্ধুকী' লাগিয়ে হিন্দুর ঘরের সুন্দরী রমণীদের খোঁজ খবর নিত এবং গায়ের জোরে তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে লুটের মালে পরিণত করত। এ ব্যাপারে শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখছেন, " দীনেশচন্দ্র সেন হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির সম্বন্ধ উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও লিখিয়াছেন যে, "মুসলমান রাজা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ 'সিন্ধুকী' (গুপ্তচর) লাগাইয়া ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দু ললনাদের অপহরণ করিয়াছেন।" ষোড়শ শতাব্দীতে ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানগণ এবং শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানরা এইরূপ কত শত হিন্দু রমণীকে যে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছেন তাহার অবধি নাই।" এক শ্রেণীর হিন্দু, যারা সুফী দরবেশদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাঁরা হয়তো জানেন না যে, এই সব সুফী দরবেশরাও সিন্ধুকীর কাজে নিযুক্ত হত। হিন্দু মেয়েদের সর্বনাশ করতে তারাও কম উৎসাহী ছিল না। এই সুফী দরবেশরাও কোরান পড়া এবং নামাজ রোজা করা মুসলমান। তাই তাদের চোখেও হিন্দু মাত্রই বধযোগ্য কাফের এবং হিন্দু রমণী লুটের মাল ও ভোগ্যবস্তু মাত্র।

মুসলমানরা ভারত অধিকার করার আগে আরও অনেক দেশ জয় করেছে এবং সেই সব দেশেও তারা ব্যাপক নরহত্যা করেছে, গলায় তরোয়াল ঠেকিয়ে তাদের মুসলমান করেছে এবং সেখানকার নারীজাতির মান-সম্মান নিয়েও ছিনিমিনি খেলেছে। কিন্তু 'জহর ব্রত' বা জ্বলন্ত আগুনে আত্মাহুতি দেবার ঘটনা শুধু এই ভারতের মাটিতেই ঘটেছে, আর কোন দেশে ঘটেনি। একমাত্র আমাদের মা-বোনেরাই মুসলমানের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার চাইতে মৃত্যুকেই শ্রেয় জ্ঞান করেছেন। এই জহর ব্রতের অনুষ্ঠান কতবার কত জায়গায় ঘটেছে এবং কত হিন্দু রমণী এভাবে তাঁদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন

তার খোঁজ কে রাখে? লম্পট মুসলমানদের প্রতি কতখানি ঘৃণা থাকলে এবং সতীত্ব রক্ষার ব্যাপারে কতকখানি সচেতনতা থাকলে একজন মহিলার পক্ষে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া সম্ভব তাও এই সব ঘটনা থেকে কিছুটা অনুমান করা চলে।

অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে, সীতা-সাবিত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত আমাদের মা-বোনেরা কেন আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করাকে বেছে নিয়েছিলেন! তাঁরা বিষ খেয়ে বা জলে ডুবে বা অন্য কোন উপায়েও মৃত্যুকে বরণ করতে পারতেন। ৭১২ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ-বিন-কাসেম যখন রাজা দাহিরকে হারিয়ে সিন্ধু দেশ জয় করল তখন রাজা দাহিরের স্ত্রী-কন্যাগণ ও অন্যান্য রমণীগণ, সবাই বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ করবেন বলেই স্থির করেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাজা দাহিরের এক মন্ত্রী এসে তাদের বললেন যে, মুসলমানরা মৃত নারীদেহকেও বলাৎকার করে। এই সংবাদ শোনার পরই তাঁরা আগুনে আত্মাহুতি দেবার সংকল্প করেন, যাতে মুসলমানরা তাঁদের মৃতদেহটাও কলুষিত করতে না পারে।

বর্বর মুসলমান শাসকদের আর একটি জঘন্য কাজ ছিল হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করা এবং তাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা। এককালে আজকের করাচির নাম ছিল দেবল বা দেবালয়, কারণ সেখানে সমুদ্রের পারে ছিল বিশাল এক মন্দির। সমুদ্রে অনেক দূর থেকে এই মন্দিরের চূড়া দেখা যেত। মহম্মদ বিন কাসেম, ৭১২ সালে সেই মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করে এই বর্বর কাজের সূত্রপাত করে। সেই সময়কার মুসলমান ঐতিহাসিকরা এই দানবীয় কাজকে মেকি দেবদেবীর বিরুদ্ধে মহান আল্লার মহান বিজয় বলে উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা করেছেন এবং খুবই উল্লাসের সঙ্গে তা বর্ণনা করে গিয়েছেন।

তাদের মতে এই কাজ খুবই সোজা এবং তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব। প্রথমতঃ, মন্দিরের বিগ্রহকে ভেঙে ফেলে দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, আজান দেবার জন্য একটা মিনার খাড়া করতে হবে এবং সব শেষে খুৎবা (ভাষণ) দেবার জন্য মিম্বার (আসন) বানাতে হবে। কত কম সময়ের মধ্যে এই কার্য সমাধা করা সম্ভব আজমীরের 'আড়াই দিন কা ঝোপড়া' তার সাক্ষী হয়ে আছে। বিগত ১০০০ বছরে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মন্দির মুসলমানরা ভেঙে ধূলিসাৎ করেছে, নয়তো মসজিদে রূপান্তরিত করেছে। সুলতান মামুদ সোমনাথের সুদৃশ্য মন্দির ভেঙেছে। বাবরের দ্বারা অযোধ্যার রাম জন্মভূমি মন্দির, এবং ঔরঙ্গজেবের দ্বারা কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ও মথুরার কেশব দেবমন্দির ভাঙা ও তাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা এর অন্যতম। মুসলমান পরাধীনতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই মন্দির ভাঙার কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। মাঝে আকবরের আমলে কিছুদিন বন্ধ থাকে এবং ঔরঙ্গজেবের আমলে তা আবার তুঙ্গে পৌঁছায়।

অনেকের মনে এই ধারণা থাকতে পারে যে, মুসলমানদের দ্বারা ব্যাপক হারে হিন্দুহত্যা, হিন্দুর সম্পত্তি লুটপাট করে আত্মসাৎ করা, হিন্দু রমণীদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে লুটের মালে পরিণত করা ইত্যাদি ঘটনা এক-কালে মধ্যযুগে ঘটেছে বটে, তবে আজ তার আর পুনরাবৃত্তি হবে না। আজ দেশ ও সমাজ সভ্যতার পথে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, তাই মুসলমানদের কাছ থেকে সেই সব বর্বরতার আশঙ্কা নেই।

এই সব ব্যক্তিদের জানা নেই যে সমস্ত পৃথিবী সভ্যতার পথে অগ্রসর হলেও ইসলাম ও কোরান এবং সেই সঙ্গে মুসলমান সমাজও সেই মধ্যযুগেই দাঁড়িয়ে আছে। তারা সভ্যতার পথে এক পাও অগ্রসর হয়নি। যেই কোরান মধ্যযুগের মুসলমানদের সমস্ত রকম বর্বর কাজে অনুপ্রাণিত করত, সেই একই কোরান আজকের মুসলমান সমাজকেও উপরিউক্ত সকল রকম বর্বর কাজে একই ভাবে প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। কোরানের কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়, তাই কাফেরের প্রতি মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গীরও কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। শুধু সুযোগের অপেক্ষা মাত্র। অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে আজও মুসলমানরা কাফের কেটে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে, কাফেরের মৃতদেহ দিয়ে পাহাড় তৈরি করবে। কাফের রমণীদের লুটের মালে পরিণত করবে এবং কাফেরের মন্দির ভেঙে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। তফাত শুধু এই যে, এক-কালের তলোয়ার, শূল, বর্শা, তীর-ধনুক ইত্যাদির বদলে আজ এ কে ৪৭ রাইফেল, গ্রেনেড, বোমা, মর্টার, রকেট ইত্যাদি উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার হবে। উদ্দেশ্য একই, কাফের নির্মূল করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করা।

আমাদের পাশের দেশ বাংলাদেশে এই কাফের-নিধন, কাফেরের সম্পত্তি লুণ্ঠন, কাফের রমণীদের অপহরণ, কাফেরদের মন্দির ধ্বংসকরণ ইত্যাদি ইসলামী কাজকর্ম বিনা বাধায়, বিরামবিহীনভাবে ঘটে চলেছে। বিগত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যে ব্যাপক হিন্দু-নিধন ও হিন্দু-নির্যাতন ঘটেছে তা বর্ণনা করতে লেখক আনোয়ার শেখ তাঁর ''This is Jehad'' গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখছেন, ''Brutalities committed on Hindus in East Bengal in 1971 are without parallel in human history. In many cases a whole community was encircled. Mothers and daughters were raped on mass scale, in presence of brothers or fathers. Breasts of elderly ladies were chopped off. Pregnant women were disemboweled, children's heads were smashed on the floor. Then followed chopping off of genitals, gouging out of eyes, and finally chopping off of heads of male members.

As a grand climax everybody was put in a house and the house was set on fire. And the same demons have reappeared as satan incarnates at Kargil and Batalik. We need to take care of these beasts before they can do further harm.''

—অর্থাৎ, "বিগত ১৯৭১ সালে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের ওপর যে নারকীয় বর্বরতার অনুষ্ঠান করা হয়েছে তার তুলনা মানব ইতিহাসে অনুপস্থিত। বহু ক্ষেত্রে সমগ্র অধিবাসীদেরকেই ঘিরে ফেলে অত্যাচার চালানো হয়েছে। মা এবং মেয়েকে একসঙ্গে তাদের বাবা বা ভাইয়ের সামনে বলাৎকার করা হয়েছে। বয়স্কা মহিলাদের স্তন কেটে ফেলা হয়েছে। গর্ভবতী মায়েদের গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে এবং মেঝেতে আছাড় মেরে শিশুদের মাথা থেঁৎলে দেওয়া হয়েছে। তারপর বয়স্ক পুরুষদের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে, চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে এবং সব শেষে ধড় থেকে মাথা আলাদা করে ফেলা হয়েছে। চরম উল্লাসের আনন্দ পাবার জন্য পরিবারের সবাইকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে সেই ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে। সেই দানবরাই আজ শয়তানের অবতার হিসাবে কার্গিল ও বাতালিকে উপস্থিত হয়েছে। ঐ পশুরা যাতে আর কোন ক্ষতি করতে না পারে সে জন্য আমাদের সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।"

সেই সময় বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার বিখ্যাত 'রমনা কালী মন্দির'ও ধূলিসাৎ করা হয়। পরে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে সেখানকার হিন্দুরা সেই কালী মন্দির পুনর্নির্মাণ করার জন্য বাংলাদেশী সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু যেই মুজিবর রহমানকে আমাদের দেশের সংবাদ মাধ্যম ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলীম সম্প্রীতির দূত বলে প্রচার করে থাকেন, সেই মুজিবুর রহমানই হিন্দুদের সেই দাবিকে নাকচ করে দেন। বর্তমানে হিন্দু-মুসলীম সম্প্রীতির দূত বলে প্রচারিত মুজিবুর রহমানের কন্যা বেগম শেখ হাসিনাও হিন্দুদের সেই আবেদন শুধু খারিজ করে দেন তাই নয়, রমনা কালীবাড়ীর সমস্ত চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করতে সেখানে এক মনোরম বাগান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আজ বাংলাদেশে যত হিন্দু আছেন, জনসংখ্যার অনুপাত হিসাবে, অন্ততপক্ষে ৮০ জন হিন্দুর পার্লামেন্ট নির্বাচনে মনোনয়ন পাবার কথা। কিন্তু হিন্দু-মুসলীম সম্প্রীতির দল হিসাবে পরিচিত বেগম হাসিনার আওয়ামী লিগ গত নির্বাচনে মাত্র ৪ জন হিন্দুকে মনোনয়ন দিয়েছে, যা হিন্দুদের ন্যায্য প্রাপ্যের মাত্র ৫ শতাংশ।

বাংলাদেশের অনেক বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাহিত্যিক ও শিল্পী আজ কলকাতায় আনাগোনা করছেন, বিশ্বমানবতার কথা বলছেন। কিন্তু বাংলাদেশে-হিন্দু নির্যাতনের ব্যাপারে তাঁরা সোচ্চার হচ্ছেন না কেন? এইসব বুদ্ধিজীবীদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয় কোরানে কাফের-নিধন করার, কাফেরের

ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করার, কাফের মেয়েদের গণিমতের মাল হিসাবে গণ্য করার, কাফেরদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার যে সমস্ত নির্দেশ রয়েছে সেগুলোকে কি তাঁরা মানবিক বলে মনে করেন? যদি না করেন তবে তার বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার হচ্ছেন না কেন বা কলম ধরছেন না কেন?

প্রকৃতপক্ষে আমাদের মত কাফেরদের বিভ্রান্ত করতেই এই সব বুদ্ধিজীবীরা কলকাতায় আসেন। এঁরা লেখক হোন, সাহিত্যিক হোন, শিল্পী হোন, যাই হোন না কেন, এঁদের আসল পরিচয় হল এঁরা মুসলমান। দিনে ৫ ওয়াক্ত নামাজের মধ্য দিয়ে এঁরা কাফের-নিধনের প্রতিজ্ঞা করেন এবং খুৎবার মধ্য দিয়ে কাফের-নিধনের উপদেশ পান। অনুকূল পরিস্থিতিতে এই সব বুদ্ধিজীবীরাও যে দশ-বিশটা কাফের হত্যা করে 'গাজী' হবার চেষ্টা করবেন না তা জোর দিয়ে অস্বীকার করা যায় না। গুরু গোবিন্দ সিংহ বলে গিয়েছেন, দক্ষিণ বাহুতে তেল মেখে তিলের মধ্যে ঢুকিয়ে হাত বের করে আনলে যত তিল লেগে থাকে তত বারও যদি কোন মুসলমান প্রতিজ্ঞা করে যে আমি হিন্দুর বন্ধু তবুও তার কথায় বিশ্বাস করবে না। কোরানে বিশ্বাসী মুসলমান কখনও মানবিক হতে পারে না। কোন মুসলমানকে মানবিক হতে গেলে প্রথমেই কোরানে অবিশ্বাস করতে হবে, তখন সে আর মুসলমান থাকবে না।

বাংলাদেশের এই সব বুদ্ধিজীবীরা খুব ভাল করেই জানেন যে তার ভাইরা কিভাবে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তালিবানদের ডেকে এনে কিভাবে তারা জেহাদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। পাকিস্তানী গুপ্তচর সংস্থা আই. এস. আই.'র সঙ্গে হাত মিলিয়ে কিভাবে তারা ভারত দখলের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কি ভাবে বাংলাদেশী মুসলমানদের অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবাংলা ও অসম বিনা যুদ্ধে দখল করার কাজ এগিয়ে চলেছে। এটা তাদের অবশ্যই জানা আছে যে, ৫ কোটি বাংলাদেশী মুসলমান ভারতে চালান করার লক্ষ্য হিসাবে ৩ কোটি মুসলমান ইতিমধ্যেই ভারতে ঢুকে পড়েছে। অসমের ৯টি জেলাকে তারা ইতিমধ্যেই মুসলমান প্রধান করে ফেলেছে এবং পশ্চিম বাংলার ৫টি সীমান্তবর্তী জেলারও ঐ একই অবস্থা হয়েছে। বাংলাদেশের কার্যকরী সীমা ইতিমধ্যে ২৫ থেকে ৩০ কিমি পশ্চিম বাংলার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, যেখানে কোন হিন্দু থাকতে পারছে না। বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে যে সব হিন্দু ঐ সব সীমান্ত অঞ্চলে বসতি করেছিলেন, তারা আবার নতুন করে উদ্বাস্তু হচ্ছেন। তাদের জমির ফসল, গোয়ালের গরু, পুকুরের মাছ এবং ঘরের মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সীমান্ত অঞ্চলে রাতারাতি হাজার হাজার মসজিদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তৈরি হচ্ছে ইসলামী মুজাহিদ তৈরি করার কারখানা শত শত মাদ্রাসা। এ সব কিছুই ঐ সব বুদ্ধিজীবীদের জানা আছে এবং এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি

থেকে হিন্দুর দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে দেবার জন্যই যে বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীরা কলকাতায় আসেন, বিশ্ব মানবতার উপর বক্তৃতা করেন তা বুঝতে আর বাকি থাকে না।

যাই হোক, ইসলামী মতে মুসলমানরা যে আল্লার ভজনা করে, অথবা কোরানে যে আল্লার বাণী আছে, সেই একমাত্র খাঁটি ভগবান এবং অন্যান্য ধর্মের লোকেরা যে ভগবানের উপাসনা করে বা যে সব দেবদেবীর উপাসনা করে সেই ভগবান ও দেবদেবী সবই মেকি। উপরন্তু ঐ সব দেবদেবীকে আল্লার সমকক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়ে তারা আল্লার অংশী বা প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করছে। এইভাবে তারা মহাপাপ করে চলেছে। আল্লার বান্দাদের উপর তাই দায়িত্ব এসে পড়ে ভুল পথের যাত্রী এই সব লোকদের আল্লার সঠিক পথে নিয়ে আসা। সোজা কথায় না হলে অত্যাচার-উৎপীড়নের মধ্য দিয়েও তা করতে হবে এবং কোন মতেই যাকে সৎপথে আনা সম্ভব নয় তাকে হত্যা করতে হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে কাফেরদের মেকি ভগবানের উপাসনার স্থান ইত্যাদি ভেঙে ফেলাও মুসলমানদের দায়িত্বের মধ্যে এসে পড়ে এবং সেই জায়গায় আল্লার উপাসনাগার বা মসজিদ তৈরি করাও পবিত্র কর্তব্য হিসাবে দেখা দেয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করার পবিত্র কর্তব্য সব মুসলমান শাসকই অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গেই পালন করেছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্যাতনের মধ্য দিয়ে বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের দায়িত্বও তাঁরা বেশ যত্নের সঙ্গেই পালন করেছেন।

ইসলামী শাস্ত্র মতে অ-মুসলমানরা দুই ভাগে বিভক্ত—(১) জিম্মি ও (২) কাফের। যাদের 'আসমানী কেতাব' (revealed book) ও 'রসুল' (prophet) আছে তারা জিম্মি, এবং অন্যরা কাফের। ইহুদী ও খ্রীস্টানদের 'কেতাব' ও 'রসুল' আছে, তাই তারা জিম্মি, কিন্তু হিন্দুদের না আছে কেতাব, না আছে রসুল; তাই তারা কাফের। ইসলামী বিচারে হিন্দুরা জঘন্যতম কাফের কারণ তারা মূর্তিপূজা করে। উপরন্তু ঐসব মূর্তিকে আল্লার সমকক্ষ হিসাবে পূজা করে আল্লার অংশী সৃষ্টি করে। ইসলামী 'আইন শাস্ত্র' (ফিক) মতে কোন মুসলমান শাসিত রাষ্ট্রে জিম্মিদের জিজিয়া কর দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে প্রাণ রক্ষা করার অধিকার আছে বা বিধান আছে। কিন্তু হিন্দুর মত কাফেরদের সামনে মাত্র দুটো রাস্তা খোলা আছে, হয় ইসলাম গ্রহণ, নয় মৃত্যু।

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী একদিন কাজী মুঘিসুদ্দিন নামে ইসলামী শাস্ত্রে আলিম (পণ্ডিত) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, 'খরজ গৌজর' (জিজিয়া প্রদানকারী) এবং 'খরজ দিহ্' (বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কর

প্রদানকারী) হিন্দুদের সঙ্গে ইসলামী শাস্ত্র মুসলমানদের কি রকম ব্যবহার করতে নির্দেশ করে। জবাবে মুঘিসুদ্দিন বলে, "তারা হল জিজিয়া প্রদানকারী জিম্মি, জিজিয়া আদায়কারী মুসলমান কর্মচারী তাদের কাছে রৌপ্যমুদ্রা দাবি করলে তাদের উচিত সসম্মানে ও বিনয়ের সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা। সেই কর আদায়কারী যদি রেগে গিয়ে তাদের দিকে ধূলো ছুড়ে মারে তবে সে ধুলো তাদের অবশ্যই হাঁ করে গিলে ফেলতে হবে। এভাবেই তারা সেই কর আদায়কারীকে সম্মান দেখাবে। এই ভাবে বিনয়ের সঙ্গে কর দিয়ে এবং সসম্মানে ধুলো গিলে জিম্মিরা বশ্যতার প্রমাণ দেবে এবং এর মধ্য দিয়েই ইসলামের গৌরব ও মেকি ধর্মের হীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বয়ং আল্লা তাদের ঘৃণা করেন এবং বলেন, "সর্বদা তাদের পরাধীন করে রাখ।" এইভাবে সদা-সর্বদা হিন্দুদের হীন করে রাখাই আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য কারণ তারা আল্লার রসুলের (অর্থাৎ মহম্মদের) চিরস্থায়ী শত্রু। তাছাড়া আল্লার রসুল আমাদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, "তাদের হত্যা কর, লুন্ঠন কর এবং তাদের ক্রীতদাসে পরিণত কর।" তিনি বলে গিয়েছেন, "তাদের হত্যা কর অথবা ধর্মান্তরিত কর, তাদের যথাসর্বস্ব লুট কর এবং দাসত্ব করতে বাধ্য কর।" ইসলামের মহান টীকাকার হানিফার মত হল, "হিন্দুদের উপর জিজিয়া চাপিয়ে দাও" (অর্থাৎ তাদের জিম্মি হিসাবে গণ্য কর), এবং আমরা সেই মহান হানিফাকেই অনুসরণ করি। অন্যান্য টীকাকারদের মতে তাদের সামনে দুটো রাস্তা, হয় ইসলাম নয় মৃত্যু।"

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী ও কাজী মুঘিসুদ্দিনের উপরিউক্ত কথাবার্তার মধ্য দিয়ে হিন্দুর যে লাঞ্ছনার চিত্র ফুটে উঠেছে তাকে পরাধীনতা না বলে আর কিছু বলা যায় কিনা তা সুধী জনের বিচার্য। শুধু তাই নয়, সেই মুসলীম শাসনের যুগে হিন্দু কাফেরদের ঘোড়ায় চড়ার অধিকার ছিল না। কোন রকম অস্ত্র রাখা বা বহন করার অধিকার ছিল না। ঔরঙজেবের আমলে হিন্দুর কোন রকম শিরস্ত্রাণ পরা নিষিদ্ধ করা হয় এবং নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করার জন্যই গুরু গোবিন্দ সিংহ খালসাদের শিরস্ত্রাণ ব্যবহার আবশ্যিক করেন। সে সময় কোন হিন্দু পাল্কী করে যাবার সময় পথে কোন মুসলমানের সঙ্গে দেখা হলে পাল্কী থেকে নেমে সেই মুসলমানকে সম্মান দেখাতে হত। কিছুটা পায়ে হেঁটে গিয়ে তারপর পাল্কীতে উঠতে হতো। যে কোন হিন্দুর বাড়িতে যে কোন মুসলমান, স্বাভাবিক অবস্থায় ৩ দিন এবং অসুস্থ হলে যত দিন ইচ্ছা, আতিথ্য গ্রহণ করতে পারত। ঐ সময় তার সেবা-যত্ন করতে হিন্দু গৃহস্বামী বাধ্য থাকত। এমন কি সেই সময় হিন্দু গৃহস্বামী তাকে শয্যাসঙ্গিনী দিতেও বাধ্য থাকত। যে কোন মন্দিরেও যে কোন মুসলমান আতিথ্য গ্রহণ করতে এবং রাত্রিযাপন করতে পারত।

কোন হিন্দু মুসলমান হতে চাইলে কেউ তাকে বাধা দিতে পারত না। কিন্তু কোন মুসলমানকে কেউ হিন্দু করলে সেই মুসলমানকে এবং যে তাকে হিন্দু করেছে, এই দুজনকে যে কোন মুসলমান যে কোন সময় কেটে ফেলতে পারত। কোন হিন্দুর মন্দির নির্মাণ বা পুরানো মন্দিরের সংস্কার করার অধিকার ছিল না। যে কোন সময় মুসলমানরা যে কোন মন্দির ভেঙে দিতে পারত।

যে হোসেন শাহকে আজকের ঐতিহাসিকরা হিন্দু-মুসলীম সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে প্রচার করে থাকেন, সেই হোসেন শাহের আমলেও প্রকাশ্যে কোন ধর্মানুষ্ঠান করার হিন্দুর অধিকার ছিল না। সেই হোসেন শাহের আমলেই নবদ্বীপের কাজী হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল। কোন বাড়ীতে শঙ্খ বাজালে বাড়ীশুদ্ধ লোককে বেঁধে কাজীর কাছে হাজির করা হত। চাবুক দিয়ে মারা হত। হিন্দুর এই লাঞ্ছনা বর্ণনা করে কবি বিজয় গুপ্ত তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে লিখছেন—

"যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত,
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজীর সাক্ষাৎ।।
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্র কিল।
পাথরের সমান যেন ঝড়ে পড়ে শিল।।
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে।।"

হিন্দুর এই চরম লাঞ্ছনাকে, অশেষ নির্যাতনকে যারা পরাধীনতা বলতে অস্বীকার করেন তাঁরা যে কতখানি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মুসলমান তোষণের রাজনৈতিক ভাবাদর্শ দ্বারা চালিত হয়েই যে তাঁরা এই কথা বলেন এবং লেখেন তা বলাই বাহুল্য। যে সব মুসলমান শাসকরা লক্ষ লক্ষ হিন্দু কেটে নররক্তের হোলি খেলল, এই সব উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অসৎ ঐতিহাসিকদের দল তাদের প্রজানুরঞ্জক, প্রজাহিতৈষী ও ন্যায়বিচারক বলে বর্ণনা করছেন। যে মুসলমান শাসকের দল লক্ষ লক্ষ মন্দির ভেঙে তাকে মসজিদে রূপান্তরিত করল, এই সব ঐতিহাসিকের দল তাদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে বর্ণনা করছেন। যে মুসলমান শাসকদের তরোয়ালের রক্ত শুকোতে সময় পেল না, হত্যা ও উৎপীড়নের দ্বারা যারা কোটি কোটি হিন্দুকে মুসলমানে পরিণত করল, তাদের তাঁরা ধর্মের ব্যাপারে উদার বলে বর্ণনা করছেন। যেই বর্বর মুসলমান শাসকদের দল লক্ষ লক্ষ হিন্দু নারী ও শিশুকে বিদেশের বাজারে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করল সেই সব দানবদের তাঁরা অত্যন্ত কোমলহৃদয় মহাপ্রাণ শাসক বলে বর্ণনা করছেন। যে সব বর্বর শাসকের দল লক্ষ লক্ষ হিন্দু রমণীকে লুটের মালে পরিণত করল সেই সব লম্পটকে তাঁরা কাব্যানুরাগী, শিল্পানুরাগী বলে বর্ণনা করছেন। যেই দখলদারের

দল হিন্দুর সমস্ত প্রাসাদ-অট্টালিকা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভোগ দখল করল, নিজেরা একখানা ইটও গাঁথল না, তাদের তাঁরা মহান স্থাপত্য রসিক, মহান স্থপতি বলে বর্ণনা করছেন। আর আমরা মূর্খের দল কোন বাস্তবতা বিচার না করে সেই বিকৃত ইতিহাস বছরের পর বছর ধরে মুখস্থ করে চলেছি।

তবে সুখের কথা হল, যে রাজনৈতিক ভাবাদর্শ স্বাধীনতার পরবর্তী ৫০ বছর ভারতে আধিপত্য করেছে, যেই রাজনৈতিক ভাবাদর্শকে অনুসরণ করে এতদিন ইতিহাস-বিকৃতির কাজ চলেছে, সেই রাজনৈতিক কংগ্রেসী ভাবাদর্শ বা নেহরুমার্কা ভাবাদর্শ আজ পতনের মুখে। তাই আমরা, আশাবাদী মানুষরা, এটাই আশা করব যে, অদূর ভবিষ্যতে এই ভারতবর্ষে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ সম্পন্ন রাজনীতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন আজকের বিকৃত ইতিহাস আবর্জনার স্তূপ হিসাবে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। নতুন উদ্যমে নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস লেখা হবে। সেই সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস লেখার জন্য নতুন উদ্যমে গবেষণার কাজ শুরু হবে। ভারতবর্ষের সেই সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস ভারতবর্ষের স্কুল-কলেজে পঠন-পাঠন হবে। নতুন প্রজন্ম সেই সঠিক ইতিহাস পাঠ করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার সামর্থ্য অর্জন করবে। এবং এর মধ্য দিয়েই কবির প্রত্যাশা—'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'—পূর্ণ হবে।

যাঁদের শুভেচ্ছা ও নিরন্তর প্রেরণা ছাড়া এই গ্রন্থ লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হত না সেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীহরিমোহন পুরী ও শ্রীবৈদ্যনাথ বসু মহাশয়কে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। যাঁদের স্নেহ ও আন্তরিক ভালবাসা এই গ্রন্থ লিখতে আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, অগ্রজ প্রতিম সেই ডাঃ সুজিত ধর এবং শ্রীমোতিলাল সোনি মহাশয়কেও জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

এই গ্রন্থ পাঠ করে যদি পাঠকের মনে ভারতবর্ষের সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস জানার সদিচ্ছা ও আগ্রহ জাগরিত হয় তবেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। সর্বশেষে জানাই যে, এই গ্রন্থে তাজমহল সম্পর্কে যে সব তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়েছে তার জন্য আমি শ্রীপুরুষোত্তম নাগেশ ওক মহাশয়ের কাছে সম্পূর্ণভাবে ঋণী।

ইতিহাস প্রদীপেন মোহাবরণ ঘাতিনা।
লোক গর্ভগৃহং কৃৎস্নং যথাবৎ সংপ্রকাশিতম্।।

রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

শুভ জন্মাষ্টমী, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ
২২শে আগস্ট, ২০০০
কলিকাতা

দিল্লী-আগ্রার দুর্গ-প্রাসাদ

আজ দিল্লী বা আগ্রায় বেড়াতে গেলে সেখানকার গাইডরা আমাদের বলতে থাকে—এই হল অমুক প্রাসাদ, যা তৈরি করেছেন বাদশা আকবর, এই হল অমুক দুর্গ, যা তৈরি করেছেন বাদশা শাহজাহান, অথবা এই হল অমুক মিনার, যা তৈরি করেছেন সুলতান কুতুবুদ্দিন ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ দিল্লী ও আগ্রার সমস্ত দুর্গ, প্রাসাদ ও অট্টালিকা, সবই তৈরি করেছেন বিদেশী মুসলমান সুলতান ও বাদশারা। আর আমরাও নিঃশব্দে ওই সব শুনতে থাকি, বিশ্বাস করতে থাকি, কারণ আমাদের ইতিহাস বইগুলোতে এরকম কথাই লেখা আছে। আর এইসব পড়ে পড়ে আমাদের মনেও এই সব ব্যাপারে একটা গভীর বিশ্বাস বা বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গেছে। তাই এইসব কথার মধ্যে কতটা বাস্তবতা আছে বা যুক্তি আছে তা আর বিচার করি না।

কিন্তু সেই সব ইতিহাস বইগুলোতে এ কথাও লেখা আছে যে, ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে, তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে রাজপুত সম্রাট মহারানা পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে মহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করেন। ফলে দিল্লী নগরী সর্বপ্রথম মুসলমানদের অধিকারে চলে যায়। কাজেই এর আগে রাজপুত রাজারাই দিল্লীতে রাজত্ব করতেন। সাধারণ বুদ্ধি বলে যে, সেই সব রাজপুত রাজাদেরও প্রাসাদ, দুর্গ, অট্টালিকা ইত্যাদি অবশ্যই ছিল। তাঁরা গাছতলায় বা পর্ণকুটিরে বাস করতেন, এমন কথা বলা চলে না। তাই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, রাজপুত হিন্দু রাজাদের সেই সব দুর্গ-প্রাসাদ, ইমারৎ-অট্টালিকা, সব গেল কোথায়? সব কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল?

ইতিহাস বলছে, মহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করার পর সেই বছরই আজমীর (সংস্কৃত ঃ অজয়মেরু) দুর্গ দখল করেন। তারপর ভারতের বিজিত অঞ্চলগুলি ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিনকে দিয়ে তিনি গজনীতে চলে যান। এর পর কুতুবুদ্দিন গোয়ালিয়র, মীরাট, রণথম্ভোর, বারাণসী ইত্যাদি আরও অনেক দুর্গ দখল করে। ওই সব

দুর্গ সবই হিন্দু রাজাদের অধীনে ছিল। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এত জায়গায় হিন্দুদের এত দুর্গ ছিল কিন্তু দিল্লী-আগ্রায় তাদের কোন দুর্গ ছিল না, তা কেমন করে সম্ভব? কাজেই অনেকে মনে করেন, দিল্লী বা আগ্রায় মুসলমানরা একটিও দুর্গ নির্মাণ করেননি। ওখানকার সমস্ত দুর্গ-প্রাসাদই রাজপুত রাজাদের তৈরি। মুসলমানরা সেগুলো ভোগদখল করেছে মাত্র।

মুসলমান ঐতিহাসিক হাসান নিজামী তাঁর 'তাজ-উল-মাসির' গ্রন্থে লিখেছেন, "When he (Mahammad Ghori) arrived at Delhi, he saw a fortress which in height and strength had not its equal nor second throughout the length and breadth of the seven climes."—অর্থাৎ, "মহম্মদ ঘোরী দিল্লী পৌঁছে সেখানে একটা দুর্গ দেখতে পেলেন, উচ্চতা ও মজবুত গঠনের দিক দিয়ে যা ছিল অদ্বিতীয় এবং সপ্ত ভূখণ্ডে এ রকম দুর্গ আর একটিও ছিল না।"[1] কাজেই মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে মহম্মদ ঘোরী দিল্লীর কোন্ দুর্গ দেখেছিলেন? যে দুর্গ তিনি দেখেছিলেন তা কি আজকের লালকেল্লা? কারণ লালকেল্লা ছাড়া দিল্লীতে আর তেমন বড় দুর্গ কোথায়?

অথচ আমাদের ঐতিহাসিকদের মতে শাহজাহান বাদশা হবার পর দিল্লীতে 'শাহজাহানাবাদ' নামে একটা নতুন রাজধানী স্থাপন করার পরিকল্পনা করেন এবং সেই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে তিনি লালকেল্লা তৈরি করেন।[2] তাঁদের মতে ১৬৩৮ সালে লালকেল্লার নির্মাণ শুরু হয় এবং ১৬৪৮ সালে তা শেষ হয়। এই সব কথা বলার সাথে সাথে তাঁরা আরও একটা কথা বলেন, যাতে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। তাঁরা বলেন যে নতুন কেল্লা তৈরি করার সাথে সাথে শাহজাহান পুরাণো প্রাসাদ অট্টালিকাগুলোরও সংস্কার সাধন করেন।[3] এই প্রসঙ্গে তাঁরা

---

(1) H. M. Elliot and J. Dowson, THE HISTORY OF INDIA -As Told By its Own Historians, (in 8 Volumes), Low Price Publications, Delhi (1996), II, 216.

(2) R. C. Majumdar (General Editor), The History And Culture of The Indian People, Bharatiya Vidya Bhavan (in 12 Volumes), Mumbai (1996), VI, 783.

(3) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VI, 787.

আরও বলেন যে, শাহজাহান লালকেল্লায় একটি নহবৎখানা নির্মাণ করেন[4] এবং লালকেল্লার গায়ে একটি ফার্সী কবিতা খোদাই করে দেন।[5] কবিতাটির বাংলা করলে দাঁড়ায়, "স্বর্গ যদি কোথাও থেকে থাকে, তবে তা এখানে এখানে এখানে।" এসব বিবরণ থেকে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রাজপুতদের যে সাবেক কেল্লা ছিল, শাহজাহান তার কিছু কিছু সংস্কার সাধন করেন এবং ফার্সী কবিতা খোদাই করে ও মসজিদ নির্মাণ করে তাকে একটা ইসলামী চেহারা দেবার চেষ্টা করেন।

এই অনুমান আরও দৃঢ় হয় যখন দেখা যায় যে, মীনহাজ-উস-সিরাজ রচিত 'তাবাকৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থে লালকেল্লার পরোক্ষ উল্লেখ রয়েছে। ওই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, শাহজাহানের প্রায় ৪০০ বছর আগে বক্তিয়ার খিলজি ১২৪৩ সালে বিহার থেকে দিল্লীতে আসেন সুলতান কুতুবুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে। ওই সময় একটা হাতীর সঙ্গে বক্তিয়ারের লড়াই হয়। বক্তিয়ার একটা কুঠার দিয়ে হাতীটার শুঁড়ে আঘাত করলে হাতীটা পিছু হঠে যায় এবং বক্তিয়ারের জীবন রক্ষা পায়। 'তাবাকৎ-ই-নাসিরি' বলছে, দিল্লীর এক মর্মর প্রাসাদে এই লড়াই হয়।[6] কিন্তু প্রশ্ন হল লালকেল্লার 'দেওয়ান-ই-খাস' ছাড়া হাতীর সঙ্গে লড়াই হবার মত অত বড় মর্মর প্রাসাদ দিল্লীর আর কোথায় আছে?[7] এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণ হয় যে, শাহজাহানের ৪০০ বছর আগেও লালকেল্লার অস্তিত্ব ছিল।

জিয়াউদ্দিন বারণি তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থে লিখছেন, "Towards the end of the year 695 H. (1296 A.D.), Alauddin (Khilji) entered Delhi in great pomp and with a large force. He took his seat upon the throne in the 'daulat-khana-i-julus', and proceeded to the Kushk-i-lal (red palace), where he took up his abode" (Elliot & Dawson, III, 160). অর্থাৎ, "৬৯৫ হিজরীর শেষের দিকে আলাউদ্দিন (খিলজী) বিশাল এক বাহিনী সঙ্গে করে খুব ধুমধামের সঙ্গে দিল্লী নগরীতে প্রবেশ করলেন।

---

(4) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VI, 788. (5) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VI, 789. (6) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, II, 306. (7) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VI, 790.

তিনি 'দৌলত-খানা-ই-জুলুস'-এর সিংহাসনে বসলেন, তারপর কুশক্-ই-লাল বা লাল প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং সেখানেই তিনি তাঁর বাসস্থান নির্বাচন করলেন।" এখানে উল্লিখিত লাল প্রাসাদ লালকেল্লা ছাড়া আর কি হতে পারে? কিন্তু এত সব অভ্রান্ত প্রমাণ হাতের কাছে থাকতেও আমাদের ঐতিহাসিকরা লিখে চলেছেন, লালকেল্লা সম্রাট শাহজাহান তৈরি করেছেন এবং মিথ্যা কথা লিখে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন।

দিল্লীতে দুটো কেল্লা আছে, লালকেল্লা আর পুরাণো কেল্লা। আমাদের ঐতিহাসিকদের মতে পুরাণো কেল্লা তৈরি করেছেন শেরশাহ।[৪] তাহলে তাঁদের কথা অনুসারে শেরশাহের আগে দিল্লীতে কোন কেল্লাই ছিল না। তাহলে মহম্মদ ঘোরী দিল্লীতে এসে কোন্ কেল্লা দেখেছিলেন এবং শেরশাহের আগে যে সব মুসলমান সুলতানরা দিল্লীতে রাজত্ব করেছিলেন তাঁরা কোন্ কেল্লা ব্যবহার করেছিলেন? কাজেই এ সব আলোচনা থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে, আজকের লালকেল্লা শাহজাহান তৈরি করেননি। শাহজাহানের কয়েক শতাব্দী পূর্বে হিন্দু রাজপুত রাজারাই ঐ দুর্গ তৈরি করেছিলেন। মুসলমানরা গায়ের জোরে তা ভোগ-দখল করেছেন মাত্র।

ভারতের হিন্দু সভ্যতা যে কতদিনের প্রাচীন, তা আজ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থই আজকের দিল্লী হয়েছে। তাই কত মহান রাজা-মহারাজা যে দিল্লীতে রাজত্ব করে গেছেন তা বলে শেষ করার উপায় নেই। মুসলমানরা যখন দিল্লী অধিকার করে তখনও দিল্লী 'ইন্দ্রপৎ' বা ইন্দ্রপ্রস্থ মৌজার অন্তর্গত ছিল। কুতুবুদ্দিনের সমসাময়িক মুসলমান লিপিকারেরাও তা উল্লেখ করে গিয়েছেন[৯]। কাজেই, যেই ইন্দ্রপ্রস্থে এককালে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজত্ব করে গিয়েছেন, সেই ইন্দ্রপ্রস্থ মুসলমান পরাধীনতার যুগে দুশ্চরিত্র, লম্পট মুসলমান শাসকদের স্পর্শে কলঙ্কিত হয়েছে, অপবিত্র হয়েছে। হিন্দু জাতির পক্ষে এর চেয়ে লজ্জা ও গ্লানিকর আর কি হতে পারে!

তবে সম্রাট পৃথ্বীরাজের পরে, অল্পদিনের জন্য হলেও, আর এক হিন্দু বীর 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন,

---

(8) Atul Chandra Roy, Bharater Itihas (in Bengali), Maulik Library, Calcutta (1985), I, 184. (9) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, II, 216.

সেটাও কম গৌরবের নয়। সেই বীর হিন্দু সন্তানের নাম হেমরাজ বা হিমু। আজকের ঐতিহাসিকরা আক্রমণ ও লুন্ঠনকারী বিদেশী মুসলমান দস্যুদের মহান করে দেখাতে ব্যস্ত। তাই হিমুর দিল্লী পুনর্দখল ও সিংহাসন আরোহণকে আজ লঘু করে দেখানো হয়। সামান্য একজন মুদিদোকানের মালিক থেকে যিনি স্বীয় প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, সাহস ও প্রবল দেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত দিল্লীর সম্রাট হয়েছিলেন। তাঁর না ছিল কোন পারিবারিক আভিজাত্য, না ছিল কোন আর্থিক বল। প্রবল সেই মুসলমান শাসনের যুগে ভারতমাতার এই বীর সন্তান কেমন করে সেই সমস্ত প্রতিকূলতাকে পায়ে দলে দিল্লীর সিংহাসনে আবার হিন্দু রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে ঘটনা অতিশয় চমকপ্রদ। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে যদি সম্রাট হেমরাজ আকস্মিকভাবে আহত না হতেন তবে আজকের ইতিহাসে মোগল সম্রাটদের ইতিহাসের বদলে হেমরাজ বংশের ইতিহাস লেখা হত। কিন্তু দুঃখের কথা হল, আজকের ঐতিহাসিকরা সম্রাট হেমরাজকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করে চলেছেন। আশা করা যায় ভবিষ্যৎ যুগের ঐতিহাসিকরা তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও গৌরব ফিরিয়ে দেবেন। তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করবেন।

যাই হোক, দিল্লীর লালকেল্লার মত আগ্রার দুর্গের ব্যাপারেও ঐ একই কথা বলা চলে। আগ্রার যে দুর্ভেদ্য দুর্গ আজ আমরা দেখছি, আকবর বা অন্য কোন মুসলমান বাদশা তা তৈরি করেননি। এককালে ভারতের হিন্দু রাজারাই তা তৈরি করেছিলেন। মুসলমানরা শুধু তা ভোগ-দখল করেছেন।

অতি প্রাচীন কালে আগ্রা মথুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অত্যাচারী কংস ছিলেন মথুরার রাজা। কংস তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের আগ্রার জেলখানায় কয়েদ করে রাখতেন। মুসলমান লিপিকার আবদুল্লা তাঁর 'তারিখ-ই-দাউদি' গ্রন্থে লিখছেন যে, বাদশা আকবর আগ্রাতে থাকতে খুব পছন্দ করতেন এবং এর ফলেই আগ্রা একটা শহরের রূপ পায়। এর আগে আগ্রা ছিল একটা অজ্ঞাত অখ্যাত গ্রাম মাত্র। অথচ সেই আবদুল্লাই আবার লিখছেন যে, গজনীর মামুদ আগ্রা আক্রমণ করে তাকে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।[10]

দেওয়ান-ই-সলমন নামে এক মুসলমান কবি তাঁর কবিতার মধ্য

---

(10) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, IV, 450.

দিয়ে সমসাময়িক অনেক ঘটনার বর্ণনা লিখে রেখে গিয়েছেন, যার কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। একটি কবিতা থেকে জানা যায় যে, মহম্মদ ঘোরী যখন আগ্রা আক্রমণ করেন তখন রাজপুত রাজা জয়পাল আগ্রার রাজা ছিলেন, তখনকার সেই দুর্গ এত দুর্ভেদ্য ও শক্তিশালী ছিল যে, সলমনের বর্ণনায়, ''A thousand asault were made, but their hearts did not quake....The fort of Agra is built amongst the sands, like a hill, and the battlements of it are like hillocks.''[11] —অর্থাৎ, "হাজার বার আঘাত করা সত্ত্বেও তার হৃদয় কম্পিত হল না। আগ্রার দুর্গ যেন বালির মধ্যে পাহাড়ের মতই দাঁড়িয়ে আছে এবং তার প্রাকার যেন দুর্ভেদ্য টিলা।"

অপর দিকে, নিজামুদ্দিন আহম্মদ তার 'তাবাকৎ-ই-আকবরী' গ্রন্থে লিখছেন, ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে আকবর আগ্রায় নতুন একটি দুর্গ নির্মাণের আদেশ জারি করেন এবং চার বছরের মধ্যে সেই দুর্গ নির্মাণের কাজ শেষ হয়।[12] নিজামুদ্দিনের মতে আগ্রায় আগে ইটের তৈরি দুর্গ ছিল এবং আকবর সেই দুর্গের ভিতের ওপরে সম্পূর্ণ পাথরের তৈরি বর্তমান দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায়, আজকের আগ্রা দুর্গের মত বিশাল এক দুর্গ কি মাত্র চার বছরের মধ্যে তৈরি করা সম্ভব? যদি সাবেক দুর্গ ইটের তৈরি হত, তাহলে দেওয়ান-ই-সলমন কি তাকে একটা দুর্ভেদ্য পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করতেন? কাজেই সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, আকবর কি কোন নতুন দুর্গ আদৌ তৈরি করেছিলেন, না কি রাজা জয়পালের সাবেক দুর্গেরই কিছু মেরামত ও সংস্কার করেছিলেন মাত্র।

এই সংস্কার করতেও কতদিন লেগেছিল সে ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। আবুল ফজলের মতে আকবর ৮ বছরের মধ্যে দুর্গ তৈরির কাজ শেষ করেন। জাহাঙ্গীরের মতে ১৫ বছর ধরে দুর্গ তৈরির কাজ চলে।[13] এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, বাবরের সময়ও আগ্রা দুর্গের অস্তিত্ব ছিল। ১৫২৬ সালের ৪ঠা মে, বাবর সর্বপ্রথম আগ্রায় পা দেন এবং তার আগেই ছেলে হুমায়ুন আগ্রা দুর্গ অধিকার

---

(11) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, IV, 522. (12) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, V, 295. (13) V. A. Smith, Akbar The Great Mogul, Oxford Clarendon Press, 76.

করেছিলেন। এর পর বাবর যখন আগ্রার দুর্গ ত্যাগ করে মহারানা সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন তখন হুমায়ুনই আগ্রা দুর্গ রক্ষা করতে থাকেন।

সব থেকে বড় কথা হল, দিল্লীর লাল কেল্লাই হোক আর আগ্রার দুর্গই হোক, ভিতরের প্রাসাদ, সভাঘর, সভাঘরের স্তম্ভ, সব কিছুর মধ্যেই হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন অত্যন্ত স্পষ্ট। সব কিছুই হয় রাজপুত নয়তো গুজরাটি শৈলীতে তৈরি। মুসলমানরা যা করেছে তা হল, ওঁ, পদ্মফুল, দেবদেবীর মূর্তি ইত্যাদি সমস্ত হিন্দু চিহ্নকে লোপাট করে তার জায়গায় কিছু কিছু ইসলামী চিহ্ন যুক্ত করে দিয়েছে। অনেকের বিশ্বাস যে, ঐ সব হিন্দু চিহ্ন জড়ো করে ঐ সব দুর্গেরই কোন গুপ্ত কক্ষে রক্ষিত আছে। অথবা মাটির নিচে প্রোথিত করা আছে।

কাজেই দিল্লীর লালকেল্লা শাহজাহান তৈরি করেছেন, না তা আগেকার রাজপুত রাজাদের তৈরি অথবা আগ্রাদুর্গ আকবর তৈরি করেছেন, না তা রাজপুত রাজা জয়পালের তৈরি তা বিতর্কের বিষয়। একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানই এই সব বিতর্কের অবসান ঘটাতে পারে। সত্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে।

শেরশাহের রাস্তা নির্মাণ

ছোটবেলা থেকেই আমরা আমাদের ইতিহাস বইগুলোতে পড়ে আসছি, শেরশাহ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তৈরি করেছেন। আমাদের ঐতিহাসিকরাও মহানন্দে এই কথা লিখে চলেছেন এবং আমরাও মনের আনন্দে তা মুখস্থ করে চলেছি। বিশ্বাস করে চলেছি। কোন বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন মনে করিনি।

অবিভক্ত ভারতে এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ঢাকার নিকটবর্তী সোনার গাঁ থেকে পাঞ্জাবের সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে বলা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এই রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল ১৫০০ কোশ (kos) বা ক্রোশ, অর্থাৎ ৩০০০ মাইল বা ৪৮০০ কিলোমিটার।[14] ডঃ অতুলচন্দ্র রায়ের মতে এই রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল ১৪০০ মাইল যা রমেশচন্দ্র মজুমদারের দেওয়া দৈর্ঘ্যের অর্ধেকেরও কম।[15]

আমাদের ঐতিহাসিকদের মতে শেরশাহ শুধু গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তৈরি করেই ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি আরও তিনটি রাস্তা তৈরি করেছিলেন। (১) আগ্রা থেকে দক্ষিণে বুরহানপুর পর্যন্ত (দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০০ মাইল)। (২) আগ্রা থেকে চিতোর হয়ে যোধপুর পর্যন্ত (দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ মাইল) এবং (৩) লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত (দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ মাইল)। কাজেই রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে শেরশাহ যে সব রাস্তা করেন তার মোট দৈর্ঘ্য ৩৯০০ মাইল বা ৬২৪০ কিলোমিটার।[14] এবং অতুলচন্দ্র রায়ের হিসাব মত তা ২৩০০ মাইল বা ৩৬৮০ কিলোমিটার।[15]

কিন্তু ঐ সব ইতিহাস বইগুলোতে এ কথাও লেখা আছে যে, ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই মে, কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে শের শাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। ঐ বছরই পাঞ্জাবের গক্কর জাতির লোকদের বিদ্রোহ দমন করতে তাঁকে ঝিলম নদীর তীরে যেতে হয়। সেখান থেকে ফিরে ১৫৪১ সালের মার্চ মাসে তাঁকে বাংলায় আসতে হয় বিদ্রোহ দমন করতে। পরের বছর, ১৫৪২ সালে শেরশাহ রাজপুত রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযান করে মালব অধিকার করেন। ১৫৪৩ সালে তিনি মধ্যভারতের রাজা পুরণমলের বিরুদ্ধে অভিযান করে রায়সিন

---

(14) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 87. (14) R. C. Majumdar, H. C. Raychaudhuri and K. Datta, An Advanced History of India, The MacMillan & Co. (1980), 434. (15) Atul Chandra Roy, ibid, I, 32.

দুর্গ দখল করেন এবং সেই বছরই মারওয়ারের রাজপুত রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। পরের বছর ১৫৪৪ সালে তিনি রাঠোর রাজ মালদেবের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং ১৫৪৫ সালের মে মাসে কালিঞ্জর দুর্গে এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শেরশাহ রাজত্ব করেছিলেন সাকুল্যে ৫ বছর, যার মধ্যে পুরো ১ বছর কেটেছে শুধু কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করতে।[16] বাকী ৪ বছরও তাঁকে নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। তাঁর এই ৫ বছরের রাজত্বকাল হল ভারতে মোগল-পাঠান দ্বন্দ্বের সময়। তাই তাঁকে যেমন প্রবল হিন্দু রাজাদের সঙ্গে লড়তে হয়েছে, তেমনি মোগল শাসকদের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছে। তাই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এবং এত ব্যস্ততার মধ্যে কোন শাসকের পক্ষে কি ৩৬০০ কিলোমিটার (মতান্তরে ৬২০০ কিলোমিটার) রাস্তা তৈরি করা সম্ভব? আজকের উন্নত কারিগরির যুগেও তা সম্ভব কিনা তা সুধীজনের বিচার্য। সব থেকে বড় কথা হল, রাস্তা তৈরির এসব তথ্য কোথা থেকে পেয়েছেন তার কোন সূত্রনির্দেশ আমাদের ঐতিহাসিকরা করেন না।

এই সব আষাঢ়ে গল্প পড়লে মনে হয়, ছোট বেলা থেকেই শুধু রাস্তা তৈরি করাই শেরশাহের ধ্যানজ্ঞান ছিল। তাই দিল্লীশ্বর হবার সঙ্গে সঙ্গে, এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে শেরশাহ শুধু রাস্তা তৈরির কাজেই মনোনিবেশ করেছিলেন এবং রাজত্বকালের ৫ বছর দিনরাত শুধু রাস্তাই তৈরি করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ভারতের ইতিহাসের আরও একটা মারাত্মক বিকৃতির কথা বলা যেতে পারে, যা ঠিক একই রকম অবাস্তব। ম্যাক্স মুলারের মতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ সালে পশুপালক বর্বর আর্যজাতি ঋগ্বেদের পাঁচালী গাইতে গাইতে দলে উপদলে ভারতে আসতে শুরু করে এবং খ্রীঃ পূঃ ৫০০ সালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাজেই বর্বর আর্যজাতির ভারতে আগমন ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র ১০০০ বছর, ঐতিহাসিক বিচারে যা খুবই কম সময়। কিন্তু আমাদের ধরে নিতে হয় যে, এই ১০০০ বছরের মধ্যে বর্বর আর্যরা সভ্য হয়েছে এবং বেদ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি লিখে সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। যেন আর্যরা ভারতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের ঘণ্টা বাজল, আর্যরা সব কাজ ফেলে

(16) Atul Chandra Roy, ibid, I, 27

দিয়ে দিনরাত শুধু লিখতে শুরু করে দিল। এবং ১০০০ বছর পর আবার ঘণ্টা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে লেখার কাজ বন্ধ হল।

এই সব ব্যাপারে সব থেকে দায়ী হল আমাদের মূর্খতা। এই সব রূপকথার গল্প, যা জঞ্জাল হিসাবে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত, আমরা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সেই সব গাঁজাখুরি গল্প মুখস্থ করে চলেছি, বিশ্বাস করে চলেছি। আমাদের ঐতিহাসিকরা, যাঁরা এই সব অবাস্তব কথা লিখে চলেছেন, তাঁরা অবশ্যই ধিক্কারের যোগ্য। কিন্তু তার চেয়েও বেশী ধিক্কারের যোগ্য আমরা নিজেরা, যারা ঐ সব আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করে চলেছি।

যাই হোক, শেরশাহের রাস্তা তৈরির ব্যাপারে ফিরে আসা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ঢাকার নিকটবর্তী সোনার গাঁ থেকে পাঞ্জাবের সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাজেই সাধারণ বুদ্ধি বলে যে, এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে শেরশাহের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না থাকলে তাঁর পক্ষে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তৈরি করা সম্ভব হত না। কিন্তু ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে যে, শেরশাহ কেন, কোন দিল্লীর বাদশার আমলেই এই বিশাল ভূভাগ দিল্লীর একচ্ছত্র শাসনে ছিল না। আর থাকলেও তা অতি অল্প সময়ের জন্যই ছিল। এবং শেরশাহের শাসনকালে যে তা ছিল না সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। উপরন্তু এই বিশাল ভূখণ্ডে কত নদীনালা রয়েছে। কাজেই রাস্তা নির্মাণ করতে শেরশাহকে ঐ সব নদীনালার উপর অসংখ্য সেতু তৈরি করার প্রয়োজন হয়েছিল। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ৫ বছর রাজত্বকালের মধ্যে শেরশাহ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তৈরি করেছিলেন তা এক অলীক গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, শেরশাহের সমকালীন অনেক মুসলমান লিপিকারই শেরশাহের ইতিহাস লিখে রেখে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজনও কোথাও বলেননি যে, শেরশাহ হাজার হাজার মাইল রাস্তা তৈরি করেছিলেন। একমাত্র শেখ নুরুল হক রচিত 'জবদাতুৎ তাওয়ারিখ' গ্রন্থে শেরশাহের রাস্তা তৈরির কথা আছে। তাতে বলা হচ্ছে যে, "দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে যে রাস্তা আজ বিদ্যমান তা শেরশাহ তৈরি করেছেন। এর জন্য বহু জঙ্গল কাটা পড়েছিল।"(17) এই উক্তি যুক্তিসঙ্গত। পাঁচ বছরের মধ্যে দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে যোগাযোগকারী একটা রাস্তা তৈরি করা চলতে পারে।

কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য হল, যে সমস্ত রাস্তাঘাট শেরশাহ তৈরি করেছেন বলে আজ বলা হচ্ছে, মুসলমানরা ভারতে আসার আগেও সেই সব রাস্তা বিদ্যমান ছিল। মুসলমানরা আসার আগে আমাদের হিন্দু রাজারাও সর্বদাই যুদ্ধাভিযান করতেন। এমনকি মহাভারতের যুগেও আমরা নানান যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা পাই। এই সব অভিযানে অশ্বারোহী, পদাতিক ইত্যাদি সবরকম বাহিনীই থাকতো। তাছাড়া রথী, মহারথীরা চার ঘোড়ার রথ ব্যবহার করতেন। রাস্তাঘাট না থাকলে এসব সম্ভব হত কি? কাজেই এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে, অতি প্রাচীন কালেও চার ঘোড়ার রথ চলার মতন রাস্তা ভারতের সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশের রাজারাও নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিলেন। রাস্তাঘাট ছাড়া তাঁরা কি বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন?

কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকরা শেরশাহকে দিয়ে হাজার হাজার মাইল রাস্তা তৈরি করিয়েই ক্ষান্ত থাকছেন না, তাঁদের মতে শেরশাহ অত্যন্ত প্রজাবৎসল মানুষ ছিলেন এবং প্রজাদের দুঃখে তাঁর কান্নার বিরাম ছিল না। তাই তাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য শুধু রাস্তা তৈরি করেই তার মনে শান্তি ছিল না। সেই রাস্তাকে ছায়া-সুশীতল করার জন্য দুপাশে সারি সারি গাছ লাগানো হল। দুই ক্রোশ পর পর সরাইখানা বানানো হল। সেই সব সরাইখানায় হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হল। এমনকি হিন্দু প্রজাদের জন্য ব্রাহ্মণ পাচকেরও ব্যবস্থা করা হল। উপরন্তু, শুধু যে নতুন রাস্তাগুলোর জন্যই এই ব্যবস্থা করা হল তা নয়, প্রজাহিতৈষী শেরশাহ সমস্ত সাবেক রাস্তাকেও গাছ লাগিয়ে সুশীতল করলেন। সরাইখানা বানিয়ে প্রজাদের দুঃখ লাঘব করলেন এবং সব কিছু তিনি করে ফেললেন ৫ বছর রাজত্ব-কালের মধ্যে। এই সব অলীক গল্প পড়লে সেই প্রবাদবাক্যটা মনে পড়ে যায়—স্বপ্নে যদি পোলাও খাব তবে ঘি কম দেব কেন? কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকরা এত ঘি ঢেলেছেন যে তাকে পেটের পক্ষে বিপজ্জনক করে তুলেছেন।

আরও মজার কথা হল, শুধু রাস্তা তৈরি নয়, যত সদ্‌গুণ দুনিয়ায় আছে তার সবগুলোকেই তাঁরা শেরশাহের মধ্যে আরোপ করে

---

(17) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, VI, 188.

চলেছেন। প্রথমতঃ, শেরশাহ ছিলেন বিরল এক সামরিক প্রতিভা। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর মত প্রজাবৎসল শাসক খুব কম দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন পরম উদার এবং সব ধর্মকেই তিনি সমান চোখে দেখতেন। হিন্দুদের ওপর কোন অত্যাচার তো তিনি করেন নি, বরং হিন্দুদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। চতুর্থতঃ, শাসক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ এবং স্বল্প ৫ বছরের শাসনকালের মধ্যে রাজস্ব সংস্কার থেকে শুরু করে যত রকমের সংস্কার সম্ভব, তার সবই তিনি করেছেন। পঞ্চমতঃ, শিক্ষা ও শিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল খুবই প্রবল ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, শেরশাহ ছিলেন আফগানিস্তানের একজন মুসলমান পাঠান, অর্থাৎ তখনকার দিনের তালিবান। বিগত ১৯৭১ সালে এই পাঠান সৈন্যরা বাংলাদেশে যে অমানুষিক নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিল তা হয়তো অনেকেরই মনে আছে। শেরশাহের প্রকৃত জীবনচরিত পাওয়া যায় আব্বাস খাঁ সারওয়ানি রচিত 'তারিখ-ই-শেরশাহী' গ্রন্থে।[18]

তৎকালীন অন্যান্য মুসলমান শাসকের ন্যায় শেরশাহও পাইকারী দরে হিন্দুহত্যা, হিন্দুর সম্পত্তি লুঠ, হিন্দু রমণীর উপর বলাৎকার এবং হিন্দুর মন্দির ধ্বংসের ব্যাপারে সমান পটু ছিলেন। হিন্দুর সঙ্গে চরমতম বিশ্বাসঘাতকতা করতেও তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। ১৫৪০ সালে বাদশা হবার পর ১৫৪৩ সালে শেরশাহ রায়সিনের হিন্দু রাজা পুরণমলের দুর্গ আক্রমণ করেন। পুরণমলের সৈন্যরা প্রথমে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে এবং পরে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নেয়। প্রায় ৬ মাস দুর্গ অবরোধ করার পর শেরশাহ কামান দিয়ে দুর্গের ক্ষতি করতে থাকেন।[19]

পুরণমল তখন খবর পাঠালেন যে, তাঁকে ও তাঁর লোকজনকে পরিবার সহ পালিয়ে যেতে দিলে তিনি তাঁর দুর্গ ছেড়ে দেবেন। শেরশাহ তাতে সম্মতি জানান। পুরণমলের লোকজন তখন দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে এবং শেরশাহের নির্দেশ মত দুর্গের বাইরে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করতে থাকে। ইতিমধ্যে শেরশাহ সবাইকে হত্যা করার গোপন পরিকল্পনা রচনা করেন। পরদিন সকালে শেরশাহের সৈন্যরা হাতি দিয়ে তাদের ঘিরে ফেলে। অবস্থা বুঝতে পেরে পুরণমল তাঁর স্ত্রী রত্নাবলীর

(18) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, IV, 305.
(19) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, IV, 401.

মাথা তরোয়াল দিয়ে কেটে ফেললেন এবং অন্য সবাইকেও হুকুম দিলেন নিজ নিজ পরিবারের মহিলাদের মাথা কেটে ফেলতে।

মুসলমানরা ইতিমধ্যে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। আব্বাস খাঁ বর্ণনা করছে, ''While the Hindus were employed in putting their women and families to death, the Afghans on all sides commenced the slaughter of the Hindus. Puran Mal and his companions, like hogs at a bay, failed not to exhibit valour and gallantry, but in the twinkling of an eye all were slain. Such of their wives and families, as were not slain, were captured. One daughter of Puran Mal and three sons of his elder brother were taken alive, and the rest were all killed. Sherkhan gave the daughter of Puran Mal to some itinerent minstrels (bazigar),that they might make her dance in the bazars, and ordered the boys to be castrated, that the race of the oppressors might not increase.''[20] —অর্থাৎ, "হিন্দুরা যখন তাদের নিজ নিজ পরিবারের ও অন্যান্যদের (অর্থাৎ নাবালক ও শিশুদের) হত্যা করতে ব্যস্ত, ইত্যবসরে আফগানরা চতুর্দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলল এবং তাদের হত্যা করতে শুরু করে দিল। শূয়োর খানায় পড়ে গেলে যেমন হয়, হিন্দুরাও সেই রকম অসহায় হয়ে পড়ল। পুরণমল ও তাঁর লোকেরা বীরত্ব ও বিক্রম দেখাতে চেষ্টা করল বটে, তবে চোখের পলকে আফগানরা সবাইকে কেটে দুখান করে ফেলল। যে সব নারী ও শিশুদের হিন্দুরা হত্যা করে উঠতে পারেনি, তাদের সবাইকে বন্দী করা হল। তাদের মধ্য থেকে পুরণমলের এক কন্যা ও তাঁর বড় ভাইয়ের তিন ছেলেকে জীবিত রেখে বাদবাকী সকলকেই হত্যা করা হল। শের খাঁ পুরণমলের মেয়েকে কয়েকজন বাজিগরের হাতে তুলে দিল, যাতে তারা তাকে হাটে বাজারে নাচাতে পারে, আর ছেলে তিনটিকে খোজা বানাবার হুকুম দেওয়া হল, যাতে অত্যাচারীরা (অর্থাৎ হিন্দুরা) বংশবিস্তার করতে না পারে।" এ হেন শেরশাহকে আমাদের ঐতিহাসিকরা যখন সর্বগুণে গুণান্বিত করে তাঁদের বইতে উপস্থিত করেন তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিগত হাজার বছরের গোলামী ক্লীবত্বের কোন স্তরে তাঁদের পৌঁছে দিয়েছে।

---

(20) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, IV, 403.

রোটাস দুর্গের হিন্দু রাজা হরিকৃষ্ণ রায় শেরশাহের বন্ধু ছিলেন। ১৫৩৭ সালে হুমায়ুন শেরশাহর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সেই সময় শেরশাহের হারেমে ১০০০ রমণী ছিল এবং তারা সবাই চুনার দুর্গে বাস করত। চুনার দুর্গ ততটা সুরক্ষিত নয়, তাই শেরশাহ বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। হুমায়ুন চুনার দুর্গ আক্রমণ করতে পারেন এই আশঙ্কায় শেরশাহ রাজা হরিকৃষ্ণ রায়কে অনুরোধ করলেন হারেম শুদ্ধ তার পরিবারকে রোটাস দুর্গে আশ্রয় দেবার জন্য। এর আগে রাজা হরিকৃষ্ণ রায় শেরশাহের ছোট ভাই মিয়া নিজাম ও তাঁর পরিবারকে রোটাস দুর্গে আশ্রয় দিয়ে উপকার করেছিলেন।

কিন্তু রাজা হরিকৃষ্ণ চট করে শেরশাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারলেন না। বর্তমানে শেরশাহ শক্তিশালী হয়েছেন। তাই তিনি দুর্গ দখল করার চেষ্টা করতে পারেন। এই আশঙ্কায় ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। কথিত আছে যে, এই সময় শেরশাহ কোরান ছুঁয়ে শপথ করেন এবং তার ফলে রাজা তাঁকে আশ্রয় দিতে রাজী হন। কিন্তু সেই মূর্খ রাজার জানা ছিল না যে, কোরান হিন্দুর ধর্মগ্রন্থের মত নয়। যেই কোরান ছুঁয়ে শেরশাহ শপথ করেছিলেন, মূর্খ সেই হিন্দু রাজার জানা ছিল না যে, সেই কোরানেই আল্লার নির্দেশ আছে যে, বিধর্মী অ-মুসলমান কাফেরদের সঙ্গে যে কোন রকম মিথ্যাচার, ছলনা ও বিশ্বাসঘাতকতা করা চলে। কোরান অনুসারে বিধর্মী কাফেররা হল পশুর সমান। তাই তাদের যে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া চলে এবং পরমুহূর্তেই সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা চলে। গরু, ছাগল ইত্যাদি ইতর প্রাণীকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া বা তা ভঙ্গ করা সবই অর্থহীন।

কাফের হিন্দুদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঠকানোর ঘটনা আজও ঘটে চলেছে। দু বছর আগে লাহোরের টেবিলে যখন আমাদের প্রধান মন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ও পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী নাওয়াজ শরীফের মধ্যে একদিকে শান্তি আলোচনা চলেছিল, অন্যদিকে তখন নাওয়াজ শরীফের নির্দেশেই কারগিলে সৈন্য সমাবেশ চলছিল। মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা ও অসামরিক পোশাক পরা পাকিস্তানী সেনারা অনেক আগেই আন্তর্জাতিক সীমারেখা লঙঘন করে ভারতের সীমানায় প্রবেশ করে অরক্ষিত ভারতীয় ঘাঁটিগুলো দখল করে নিয়েছিল। এই সব বিশ্বাসঘাতকতার উৎস হল কোরান। তাই বলা চলে যে, পৃথিবীতে যতদিন ইসলাম থাকবে, যত দিন কোরান থাকবে, ততদিন মুসলমানদের এই বিশ্বাসঘাতকতাও অবিচল থাকবে।

আজ একদিকে বাংলাদেশে হিন্দুর সম্পত্তি লুট, হিন্দু হত্যা, হিন্দু নারীর উপর বলাৎকার, বলপূর্বক হিন্দুকে ধর্মান্তরকরণ ইত্যাদি ঘটনা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ঘটে চলেছে, অন্য দিকে ভারতের হিন্দুদের বোকা বানানোর জন্য বাংলাদেশ থেকে কিছু কিছু মুসলমান বুদ্ধিজীবী কলকাতায় এসে বাঙালীর ঐক্য, বাংলাভাষার ঐক্য ইত্যাদি গালভরা বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এক প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি বিরাজ করছে ইত্যাদি মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছেন। আর কিছু কিছু হিন্দু বুদ্ধিজীবী এই নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে ভাই ভাই বলে কোলাকুলি করে চলেছেন। দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন।

যাই হোক, শেরশাহ রাজা হরিকৃষ্ণকে যেদিন প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেদিন রাত্রেই তিনি রোটাস দুর্গ দখলের ছক করে ফেললেন। ১২০০ ডুলী সাজানো হল এবং প্রত্যেক ডুলীতে দুজন করে পাঠান সৈন্য বোরখা পরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বসে রইল। প্রথম কয়েকটা ডুলীতে কিছু মহিলা ছিল। তাই দুর্গের রক্ষীরা প্রথম কয়েকটা ডুলী পরীক্ষা করে চক্রান্ত বুঝতে পারল না। এদিকে শেরশাহ রাজার কাছে খবর পাঠালো যে, রক্ষীরা ডুলী পরীক্ষা করে মুসলমান রমণীদের অসম্মান করছে। কাজেই ডুলী পরীক্ষা করা বন্ধ হল এবং প্রায় আড়াই হাজার আফগান সৈন্য দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পরক্ষণেই তারা আক্রমণ করে রক্ষীদের হত্যা করল এবং দুর্গ দখল করে নিল। রাজা হরিকৃষ্ণ কোন মতে গুপ্তপথ দিয়ে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলেন।[21] এই ঘটনাকে আমাদের ঐতিহাসিকরা শের খাঁর রোটাস দুর্গ জয় বলে বর্ণনা করে থাকেন।[22]

বাল্যকালে শেরশাহের নাম ছিল ফরিদ খাঁ। তাঁর বাবা হাসান খাঁর চার বিবির আট ছেলে ছিল। প্রত্যেক বিবির ২টি করে ছেলে ছিল। হাসান খাঁ ছিল সাসারামের জায়গীরদার। সেই ফরিদ খাঁ কি করে শের খাঁ এবং শেষ পর্যন্ত বাদশা শেরশাহ হল? আমাদের ঐতিহাসিকদের মতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, রণনৈপুণ্য, গভীর রাজনীতি-জ্ঞান, কর্মকুশলতা ইত্যাদির ফলে ফরিদ খাঁ শেরশাহ হন।

কিন্তু প্রকৃত তথ্য হল, লুটপাট ও দস্যুবৃত্তি করে হিন্দুর সম্পত্তি আত্মসাৎ করাই ছিল ফরিদ খাঁর উন্নতির প্রথম সোপান। সেই সঙ্গে

---

(21) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, IV, 361.
(22) Atul Chandra Roy, ibid, I, 25.

সঙ্গে হিন্দু পুরুষদের হত্যা করে তাদের নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করাও ছিল বড়লোক হবার আর এক প্রশস্ত পথ। এটাই ইসলামের স্বীকৃত পথ এবং নবী মহম্মদ এই সব কাজকর্ম নিজে হাতে করে মুসলমানদের শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন (বিশদ বিবরণের জন্য বর্তমান লেখকের 'ইসলামী ধর্মতত্ত্বঃ এবার ঘরে ফেরার পালা' দ্রষ্টব্য)। এর আগে আরেক দস্যু বক্তিয়ার খিলজি লুটপাট করে বিহারের মালিক হয়েছিল। তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে দস্যু ফরিদ খাঁ বিহারে আধিপত্য অর্জন করে।

এই সব দস্যুবৃত্তির কাজ কিভাবে হত? ঐতিহাসিক আব্বাস হাসান এই রকম একটি হিন্দু গ্রাম আক্রমণের বর্ণনা করতে লিখছেন, ''His horsemen he directed to patrol around the villages, to kill all men they meet and to make prisoners of the women and children, to drive in cattle, to permit no one to cultivate the fields, to destroy the crops already sown and not to permit any one to bring anything in from neighbouring parts.''[23] —অর্থাৎ, "তিনি তাঁর ঘোড়-সওয়ারদের সর্বক্ষণ গ্রামগুলোর চতুর্দিকে পাহারা দিতে বললেন। সমস্ত পুরুষদের হত্যা করতে এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করতে হুকুম দিলেন। সমস্ত গরু-বাছুর তুলে আনতে, চাষবাস বন্ধ করতে এবং খেতের শস্য বিনষ্ট করতে হুকুম দিলেন। গ্রামের কোন লোক পাশাপাশি কোন গ্রাম থেকে কিছু যাতে নিয়ে আসতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করতে আদেশ দিলেন।"

হাসান খাঁর অধীনে অনেক আফগান চাকরি করত, যাদের কোন জমিজায়গা বা জায়গীর ছিল না। প্রথমে ফরিদ খাঁ সেই সব আফগানদের জায়গীরের প্রলোভন দেখিয়ে একত্র করে ছোটখাট একটা দস্যুদল গঠন করেন। তখন বিহারে আরও অনেক আফগান এসে বসবাস করত। ফরিদ খাঁ সেই স্বজাতীয় আফগানদের আহ্বান জানান তাঁর দলে যোগ দেবার জন্য। বলেন, "যার ঘোড়া আছে সে ঘোড়ায় চড়ে এবং বাকীরা পায়ে হেঁটে আমার দলে যোগ দাও"। জায়গীর ও লুটের মাল পাবার লোভে তারাও এসে দলে যোগ দিল। এই দল নিয়ে ফরিদ খাঁ হিন্দু জমিদার ও বিত্তশালী হিন্দু প্রজাদের টাকা-পয়সা, সহায়-সম্বল লুটপাট করতে শুরু করে দিল।

---

(23) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, IV, 316.

কোন গ্রামকে আক্রমণ করার আগে ফরিদ খাঁ প্রথমে সেখানকার হিন্দু জমিদারদের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে চিঠি দিতেন, ঠিক আজকের দিনের মাফিয়া নেতারা যা করে থাকে। অভিযোগ আনতেন যে, জমিদাররা ঠিকমত খাজনা দিচ্ছে না। হিসাবে কারচুপি করে কর ফাঁকি দিচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব চিঠি দিয়ে জমিদারদের আতঙ্কে রেখে তিনি সাধারণ প্রজাদের ওপর অত্যাচার ও লুটপাট শুরু করতেন। এইভাবে প্রজাদের সম্পত্তি লুটপাট করার পর তিনি জমিদারদের আক্রমণ করতেন। এরকম একটা আক্রমণ বর্ণনা করতে আব্বাস খাঁ লিখছেন, "Early in the morning, Farid Khan mounted and attacked the criminal zamindars, and put all the rebels to death, and making their women and children prisoners, ordered his men to sell them or keep them as slaves and brought other people (ie. Afghan Muslims) to the village and settled them there.''[23] —অর্থাৎ, "অতি প্রত্যুষে ফরিদ খাঁ তার দলবল নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সেই সব অপরাধী জমিদারদের আক্রমণ করল। সমস্ত পুরুষদের হত্যা করা হল এবং বন্দী নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস হিসাবে বেচে দিতে অথবা নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে হুকুম দিল। অন্য লোকদের (অর্থাৎ, আফগান মুসলমানদের) সেখানে এনে বসতি করতে আদেশ জারি করল।" এই সমস্ত জঘন্য কাজকর্মকেই আমাদের ঐতিহাসিকরা শেরশাহের রণনৈপুণ্য, কর্মকুশলতা ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে চলেছেন, এর থেকে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে!

মধ্যযুগীয় ভারতের হিন্দু প্রজা পীড়নকারী মুসলমান শাসন বর্ণনা করতে ঐতিহাসিক Sir H. M. Elliot লিখছেন, Under such rulers, we cannot wonder that the fountains of justice are corrupted; that the state revenues are never collected without violence and outrage; that villages are burnt and their inhabitants mutilated or sold into slavery; that the officials, so far from affording protection, are themselves the chief robbers and usurpers; and that the poor find no redress against the oppressor's wrong and proud

man's consumely.[24] অর্থাৎ, "আমরা অবাক হব না, যদি দেখি যে, এই সব অত্যাচারী শাসকদের আমলে ন্যায়বিচার কলুষিত ও পক্ষপাতদুষ্ট। অথবা যদি দেখি যে, অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচারের মধ্য দিয়েই সর্বত্র রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে। গ্রামবাসীদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (বিশেষভাবে পুরুষের পুরুষাঙ্গ ও মহিলাদের স্তন) কেটে ফেলা হচ্ছে। অথবা যদি দেখি যে, যেসব রাজকর্মচারীকে রক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারাই দুর্বৃত্ত, ডাকাতের সর্দার বা উচ্ছেদকারী হানাদাররূপে আত্মপ্রকাশ করছে। আমরা অবাক হব না, যদি দেখি যে এই সব অবিচার, অত্যাচার ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে, তথা উদ্ধত শাসকদের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবিধানের কোন জায়গা সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছে অনুপস্থিত।"

তিনি আরও লিখছেন, "The few glimpses we have of Hindus slain for disputing with the muhammadans, of prohibitions against processions, worship and ablutions, and of other intolerant measures, of idols mutilated, of temples razed, of forcible conversions and marriages of proscriptions and confiscations, of murders and massacres, and of the sensuality and drunkness of the tyrants who enjoined them, show us that this picture is no overcharged, and it is much to be regretted that we are left to draw it for ourselves from out of the man of ordinary occurrences, recorded by writers who seem to sympathize with no virtues and to abhor no vices."[25]

কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকরা এই সব বিষয়গুলি সযত্নে এড়িয়ে চলেন। তাঁদের মূল দিক্-নির্দেশই হল, বিদেশী মুসলমান শাসকদের মহান করে দেখাও, মুসলমান শাসনের যুগকে পরাধীনতার যুগ বলে কখনও দেখিও না, বরং তাকে ভারতের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ হিসাবে দেখাও। ওই সব মুসলমান শাসকরা হিন্দুদের উপর যে নারকীয়

(24) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, I, xx.
(25) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, I, xxi.

অত্যাচার করেছে, কোটি কোটি হিন্দুর রক্তে ভারতবর্ষের মাটি কর্দমাক্ত করেছে, হিন্দুর ছিন্নমুণ্ড দিয়ে যে পাহাড় তৈরি করেছে তা ইতিহাসের বই থেকে লোপাট করে দাও। অথবা ঘৃণ্য হিন্দুদের দোষেই তারা তাদের হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে সেইভাবে ইতিহাসকে বিকৃত কর। তারা যে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর মন্দিরকে ধ্বংস করেছে বা মসজিদে রূপান্তরিত করেছে, তা ইতিহাসের বই থেকে সম্পূর্ণ মুছে দাও। এই নীতি অনুসরণ করে আমাদের ঐতিহাসিকরা জাতির প্রতি যে জঘন্য অপরাধ করে চলেছেন তা ক্ষমার অযোগ্য।

এসব ঐতিহাসিকদের দ্বারা আমাদের ইতিহাস কতখানি বিকৃত হয়েছে তা কয়েকটা উদাহরণ দিলে ভাল বোঝা যাবে। এঁরা মোগল-বাদশা আকবরকে 'মহামতি আকবর' বা 'Akbar the Great' লেখেন. অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতাহরণকারী একজন বিদেশী মুসলমান শাসক 'মহামতি' সম্রাট অশোকের মতই মহান। শুধু তাই নয়, পারলে তাঁরা আকবরকে অশোকের থেকেও মহান প্রমাণ করেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, অন্যান্য মুসলমান শাসকদের মত তিনটি ইসলামীগুণ treachery, lechery এবং buchery সম্রাট আকবরের মধ্যেও সমানভাবেই বিদ্যমান ছিল।

১৫৫৬ সালে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে ভাগ্যের পরিহাসে হিন্দু বীর বিক্রমাদিত্য হেমরাজ (হিমু), বিজয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছেও, শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। রণক্লান্ত এবং অতিশয় রক্তক্ষরণে মৃতপ্রায় সম্রাট হেমরাজকে বৈরাম খাঁ হাত-বাঁধা অবস্থায় আকবরের সামনে উপস্থিত করল। এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে সমকালীন মুসলমান ঐতিহাসিক আহম্মদ ইয়াদগার তাঁর "তারিখ-ই-সালাতিন-ই-আফগানা।" গ্রন্থে লিখছেন যে, সম্রাট হেমরাজকে ঐভাবে হাত-বাঁধা অবস্থায় আকবরের সামনে উপস্থিত করে বৈরাম খাঁ বলল, ''As this is our first success, let your Highness's own august hand smite this infidel with the sword. The Prince accordingly struck him and divided his head from his unclean body.''(26) —অর্থাৎ, "আজ প্রথম সাফল্যের এই শুভ মুহূর্তে আমাদের ইচ্ছা, মহান সম্রাটের মহান হস্ত তরবারির সাহায্যে এই বিধর্মী কাফেরের মস্তক ছিন্ন করুক। সেই অনুসারে সম্রাট তাঁর মস্তক অপবিত্র দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন।"

---

(26) H. M. Elliot and J. Dwoson, ibid, V, 65-66

কিন্তু আকবরের এই জঘন্য ও কাপুরুষোচিত কাজকে আড়াল করার জন্য এবং তাঁকে মহান বানাবার জন্য আমাদের ঐতিহাসিক ডঃ অতুলচন্দ্র রায় লিখছেন, "কেউ কেউ বলেন যে, আকবর হিমুকে নিজহস্তে হত্যা করিতে অসম্মত হইলে বৈরাম খাঁ হিমুর শিরশ্ছেদ করেন।[27] এখানে "কেউ কেউ" বলতে কারা, তার কোন সূত্র নির্দেশ অনুপস্থিত। এই সব ব্যাপারে আমাদের ঐতিহাসিকরা কতখানি অসৎ হতে পারেন সেটাও একটু বলা দরকার। ডঃ অতুলচন্দ্র রায় তার পরের লাইনে লিখছেন, "স্মিথ বিশ্বাস করেন যে, আকবরের ন্যায় একজন দয়াপ্রবণ ব্যক্তি তাঁহার অভিভাবকের প্ররোচনায় হিমুকে হত্যা করিয়াছিলেন।"[27]

অথচ ঐতিহাসিক স্মিথ (Vincent A. Smith) আহম্মদ ইয়াদগারের বর্ণনাকেই সমর্থন করেছেন এবং লিখছেন, ''The official story, that a magnanimous sentiment of unwillingness to strike a helpless prisoner already halfdead compelled him to refuse to obey his guardian's instruction, seems to be of the late invention of courtly flatterers, and is opposed to the clear statement of Ahmad Yadgar and Dutch writer, Van den Broccke, as well as the probabilities of the case.''[28] —অর্থাৎ, "কোন কোন সরকারী বর্ণনায় বলা হয়ে থাকে যে, মহানুভব সম্রাট সেই অসহায়, অক্ষম ও প্রায় অর্ধমৃত বন্দীকে হত্যা করতে রাজী হলেন না। তিনি তাঁর অভিভাবকের নির্দেশ অমান্য করলেন। তবে আমার মনে হয়, এসব গল্প পরবর্তীকালের কতিপয় তোষামোদকারী সভাসদদের সংযোজন। এ ব্যাপারে আহম্মদ ইয়াদগার এবং ওলন্দাজ লেখক ভ্যান ডেন ব্রোয়েকের বর্ণনাই সঠিক বলে মনে হয় এবং এটা ঘটাই স্বাভাবিক ছিল।" একজন স্বীকৃত ও স্বনামধন্য ঐতিহাসিকের নাম করে মিথ্যা কথা লেখার নাম নির্ভেজাল জালিয়াতি। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিদেশী মুসলমান শাসকদের মহান বানাবার জন্য এই সব ঐতিহাসিক নামধারী জালিয়াতের দল নিজেদের কত নিচে নামাতে পারেন।

ভিনসেন্ট স্মিথ আরও লিখছেন, ''Bairam Khan desired Akbar to earn the title of Ghazi, or Slayer of the

(27) Atul Chandra Roy, ibid, I, 40. (28) V. A. Smith, ibid, 39.
(28) V. A Smith, ibid, 39.

Infidel, by fleshing his sword on the captive. The boy naturally obeyed his guardian and smote Himu on the neck with his scimitar. The bystanders also plunged their swords into the bleeding corpse. Hemu's head was sent to Kabul to be exposed, and his trunk was gibbeted at one of the gates of Delhi.''[28] —অর্থাৎ, "বৈরাম খাঁর ইচ্ছা ছিল যে বন্দী হিমুকে তরোয়াল দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করার মধ্য দিয়ে আকবর কাফের হত্যাকারী 'গাজী' উপাধিতে ভূষিত হন। (১৪ বছরের বালক) আকবরও স্বাভাবিক ভাবেই বৈরামের নির্দেশ মান্য করে এবং তার বক্র তরবারি (শমশের) দিয়ে হিমুর গলায় আঘাত করে। পরে উপস্থিত অনুচররাও তাদের নিজ নিজ তরবারি হিমুর রক্তাক্ত দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। বিশেষ নিদর্শন হিসাবে হিমুর ছিন্নমুণ্ড কাবুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁর কবন্ধ দিল্লী নগরীর কোন একটা ফটকে ঝুলিয়ে রাখা হয়।"

আমাদের স্বনামধন্য ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এব্যাপারে কি অভিমৎ ব্যক্ত করেছেন তা জানতে পাঠকের কৌতূহল থাকতে পারে। তাই তাঁর মন্তব্যও দেওয়া গেল। ''In this helpless condition, Himu was put to death, according to some, by Bairam, on the refusal of Akbar to kill him with his own hands and, according to others, by Akbar himself at the instigation of his protector.''[29] —অর্থাৎ, "অনেকের মতে আকবর অসহায হিমুকে নিজ হাতে হত্যা করতে অস্বীকার করে এবং বৈরাম খাঁ তাঁকে হত্যা করে। অন্য অনেকের মতে রক্ষক বৈরামের নির্দেশে আকবর নিজেই তাঁকে হত্যা করে।"

তবে সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক দু এক জন যে নেই তা নয়। ঘটনার সঠিক বিবরণ দিয়ে ঐতিহাসিক এস রায় লিখছেন, ''Akbar accordingly struck Himu with his sword and Bairam Khan followed him. The story of Akbar's magnanimity and refusal to kill a fallen foe seems to be a later courtly invention. The humane and liberal emperor of Hindustan who preached 'sulh-

(29) R. C. Majumdar, ibid, Macmillan & Co., 439.

i-kull' (universal toleration) was not born but made.''[30] —অর্থাৎ, "তদনুসারে আকবর তার তরবারি দিয়ে হিমুকে আঘাত করে এবং বৈরামও তাকে অনুকরণ করে। অসহায় হিমুকে নিজ হাতে হত্যা করতে মহানুভব আকবরের অনিচ্ছার যে গল্প শোনানো হয়ে থাকে তা অবশ্যই পরবর্তীকালের কোন (চাটুকার) সভাসদের আবিষ্কার। 'সুল-ই-কুল' বা পরমত-সহিষ্ণু যে মানবিক ও উদার আকবরকে আজ তুলে ধরা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থানের সম্রাট আকবর কখনই ঐ সব গুণের অধিকারী ছিলেন না। ঐ সব গুণ তার ওপর আরোপ করা হয়েছে মাত্র।"

আকবর যে কতখানি নিষ্ঠুর ও নৃশংস ছিলেন, আর একটি ছোট্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে তা আরও সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। আকবর একদিন বিকালের নামাজ থেকে ফিরে চাকরদের ডাকাডাকি করতে লাগলেন। কিন্তু ধারে কাছে কেউ না থাকায় কেউ সাড়া দিল না। এতে আকবরের খুব রাগ হল। হঠাৎ দেখতে পেলেন যে তাঁর আসনের পাশে এক ছোকরা চাকর মেঝেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আকবর পেয়াদাদের ডেকে হুকুম দিলেন, "এক্ষুণি একে মিনারের ওপর থেকে নিচে ফেলে দাও।" পেয়াদারা তক্ষুণি তাকে আগ্রা দুর্গের ওপর থেকে নিচে ফেলে দিল। এই ঘটনা বর্ণনা করে মুসলমান ঐতিহাসিক আসাদ বেগ তাঁর 'বিকায়া' গ্রন্থে লিখছেন, ''When he (Akbar) came near the throne and couch, he saw a luckless lamp-lighter, coiled up like a snake, in a careless death-like sleep, close to the royal couch. Enraged at the sight, he ordered him to be thrown from the tower, and he was dashed into a thousand pieces.''[31]—অর্থাৎ, "সিংহাসন ও কৌচের কাছে গিয়ে তিনি (আকবর) দেখতে পেলেন যে, বাতি জ্বালাবার এক হতভাগ্য চাকর কৌচের কাছে মেঝেতে, সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে মরার মত ঘুমোচ্ছে। ক্রুদ্ধ আকবর সেই চাকরটাকে মিনারের ওপর থেকে নিচে ফেলে দিতে আদেশ দিলেন। সেই অনুসারে তাকে ছুঁড়ে ফেলা হল এবং তার শরীর হাজার টুকরো হয়ে গেল।" কোন হিন্দু রাজার দ্বারা তাঁর চাকরের প্রতি এরকম নিষ্ঠুরতা কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

---

(30) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 106.
(31) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, VI, 164.

১৫৬৭ খ্রীস্টাব্দে আকবর মেবারের রানা উদয় সিংহের (মহারানা সংগ্রাম সিংহের পুত্র) বিরুদ্ধে অভিযান করেন। চিতোর দুর্গ অবরোধ করেন। চার মাস অবরোধ করার পরও সুরক্ষিত চিতোর দুর্গের পতনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। পক্ষান্তরে রাজপুতরা জয়মল ও পট্ট নামক বীর দুই সেনাপতির নেতৃত্বে দুর্গ থেকে বাইরে এসে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে বহু মোগল সৈন্য হতাহত করতে লাগল। কোন উপায়ান্তর না দেখে আকবর চিতোর দুর্গের দেওয়াল পর্যন্ত 'সাবাৎ' খোঁড়ার হুকুম দিলেন। চামড়া দিয়ে ঢাকা পরিখাকে 'সাবাৎ' বলে। দুই দিক থেকে দুটো 'সাবাৎ' দুর্গের দেওয়াল পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সেই দুই জায়গায় বারুদ জমা করে প্রবল বিস্ফোরণ ঘটানো হল এবং প্রাচীরের অংশ বিশেষ ধ্বংস হয়ে গেল।

দুর্গ রক্ষার আর কোন উপায় নেই দেখে সেই দিনই রাজপুত রমণীরা জহরব্রতের অনুষ্ঠান করলেন। প্রায় ৩০০ রাজপুত রমণী জ্বলন্ত আগুনে আত্মাহুতি দিলেন। দুর্গের মধ্যে তখন মাত্র ৮০০ রাজপুত সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। তারাও প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে সকলেই প্রাণ দিল।

সব মিটে গেলে পরদিন সকালে বিজয়ী আকবর হাতীতে চড়ে দুর্গে প্রবেশ করলেন। তখন দুর্গের মধ্যে ছিল প্রায় ৪০ হাজার অসামরিক রাজপুত প্রজা। চিতোর দুর্গ জয় করতে আকবরকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। এই কারণে রাজপুতদের প্রতি তাঁর ঘৃণা ও রাগ চরমে ওঠে। যে অসামরিক ৪০ হাজার রাজপুত প্রজা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল, যুদ্ধের সময় তারা রাজপুত সৈন্যদের সাহায্য করেছিল। সেই কারণে তাঁর রাগ গিয়ে পড়ল ঐ নির্দোষ অসামরিক প্রজাদের ওপর। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ লিখছেন, ''The eight thousand Rajput soldiers who formed the regular garrison having been zealously helped during the siege by 40,000 peasants, the emperor ordered a general massacre, which resulted in the death of 30,000.''[32] —অর্থাৎ, "দুর্গ অবরোধের সময় ঐ ৪০,০০০ (অসামরিক) কৃষক প্রজা রাজপুত বাহিনীর ৮০০০ সৈন্যকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল। সেই কারণে সম্রাট গণহত্যার আদেশ দিলেন। ফলে সেদিন ৩০,০০০ লোককে হত্যা করা হল।" সেই সমান

(32) V. A. Smith, ibid, 90.

তালে চলল ধ্বংসলীলা এবং ঐতিহাসিক Tod এই ধ্বংসলীলাকে আকবরের "most illiterate atrocities" বলে বর্ণনা করেছেন।

আমাদের ঐতিহাসিকরা এই ঘটনাকে কিভাবে বর্ণনা করেছেন সেটা একটু দেখা যেতে পারে। ডঃ অতুলচন্দ্র রায়ের বইতে এই ঘটনার উল্লেখমাত্র নেই। ঐতিহাসিক এ. কে. মজুমদার লিখছেন, "Akbar then gave the order for mass execution of 30,000 non-combatants, for which all modern historians have condemned him. According to Kaviraj Shyamadas, however, out of 40,000 peasants who were in the fort, 39,000 had died fighting and Akbar ordered the remaining 1,000 to be executed."(33)—অর্থাৎ, "আকবর সে দিন ৩০,০০০ অসামরিক নিরীহ প্রজাকে হত্যা করেছিলেন বলে তাঁকে নিন্দা করা হয়ে থাকে। কিন্তু কবিরাজ শ্যামাদাসের মতে ঐ ৪০,০০০ প্রজার মধ্যে ৩৯,০০০ যুদ্ধ করে প্রাণ দেয়। আকবর মাত্র বাকী ১০০০ প্রজাকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছিলেন।" শ্রীমজুমদার আকবরকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে এটাই স্বীকার করেছেন যে, ওই ৪০,০০০ প্রজার সবাইকেই হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক এস. রায় এখানেও সত্য গোপন করার কোন চেষ্টা করেননি এবং লিখছেন, "Thirty thousand were slain; among them was gallant Patta, who fell after he had displayed prodigies of valour."(34) —অর্থাৎ, "সে দিন ৩০,০০০ লোককে কচুকাটা করা হয়েছিল। এর মধ্যে বীর পট্টও ছিলেন, যিনি অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেন।"

অথচ আমাদের স্বনামধন্য ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখছেন, "According to Abul Fazl, 30,000 persons were slain, but the figure seems to be highly exaggerated."(35)

সেদিন কত রাজপুত মারা পড়েছিল, তার সঠিক সংখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। আবুল ফজল যে ৩০ হাজার সংখ্যা বলেছে তা সে গুণে

---

(33) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 334. (34) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 122. (35) R. C. Majumdar, ibid, MacMillan, 443.

দেখেনি। শুধু অনুমানের উপর ভিত্তি করে ওই সংখ্যা লেখা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃত সংখ্যা ৫০ হাজার, ৮০ হাজার, ১ লাখ কি তারও বেশী হওয়া বিচিত্র নয়।

সব থেকে মজার কথা হল, এই ঘটনার শেষাংশ আমাদের সকল ঐতিহাসিকই সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। কত রাজপুত সেই দিন মারা পড়েছিল তা জানতে সম্রাটের খুব ইচ্ছা হয়। কিন্তু অত মৃতদেহ গুণবে কে? শেষে সম্রাটের আদেশ মত সব মৃতদেহের পৈতা খুলে আনা হয় এবং দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হয়। মোট ওজন দাঁড়ায় সাড়ে চুয়াত্তর মণ।[36] ভিনসেন্ট স্মিথ লিখছেন, ''The recorded amount was $74^1/_2$ mans of about eight ounce each.''[36] কাজেই প্রতিটি পৈতার ওজন ৮ আউন্স হলে, কত হাজার বা কত লক্ষ পৈতা জড়ো করলে ৭৪১/২ মণ হয় তা অনুমান করা খুব কঠিন কাজ নয়।

কথিত আছে যে পরবর্তিকালে সম্রাট ঔরঙজেব হুকুম জারি করেন যে, প্রতিদিন এত হিন্দু কাটতে হবে যাতে করে তাদের পৈতা জড়ো করলে সোয়া মণ হয়। এবং এত পরিমাণ পৈতা রোজ এনে তাঁকে দেখাতে হবে।[37] পণ্ডিতদের মতে তখনকার দিনে সব হিন্দুই উপবীত ধারণ করত। রাজপুতদের তুলনায় উত্তর ভারতের লোকদের পৈতা ছিল হাল্কা, প্রায় ৩ আউন্স। অঙ্ক কষলে দেখা যাবে যে, ৩ আউন্স ওজন বিশিষ্ট ২৪,০০০ পৈতা জড়ো করলে ওজন ১১/৪ মণ হয়। কাজেই ঔরঙজেবের উপরিউক্ত হুকুম মতে প্রতিদিন ২৪,০০০ হিন্দু হত্যা করা হত।

যাই হোক, চিতোর দুর্গের সেই নির্বিচারে গণহত্যার ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য আজও রাজপুতরা ৭৪১/২ সংখ্যাকে অত্যন্ত অভিশপ্ত বলে গণ্য করে থাকেন। একে তাঁরা 'তিলাক' বলেন। আজও কোন রাজপুত কাউকে চিঠি লিখে ওপরে ৭৪১/২ লিখে দিলে প্রাপক ছাড়া আর কেউ সেই চিঠি খোলেন না। তাদের ধারণা অন্য কেউ ওই চিঠি খুললে তাকে ওই গণহত্যার পাপ স্পর্শ করবে। এই প্রথা ক্রমে বাংলা সহ সমস্ত ভারতে চালু হয়ে যায়, এবং অত্যন্ত

(36) V. A. Smith, ibid, 91. (37) P. N. Oak, Islamic Havoc In Indian History, Pub. by Arabinada Ghosh, 376.

গোপনীয় বোঝাতে চিঠির ওপরে ৭৪১/২ অথবা ৭৪।। লিখে দেওয়া হয়। এই ৭৪।। সংখ্যার মধ্যে কত রক্তপাত, কত বেদনা ও চোখের জল লুকিয়ে আছে তা আমরা আজ অনেকেই ভুলে গেছি। তা না হলে পঞ্চাশের দশকে ৭৪।। নামে প্রখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেন অভিনীত হাস্যরসাত্মক ছবি তৈরি হতে পারত না।

ওই ঘটনার পর থেকে মেবারের কোন রানা চিতোরগড়ে আজ পর্যন্ত পা রাখেননি। রানা প্রতাপ ও পরবর্তী অন্যান্য রানারা উদয়পুরকে রাজধানী করে সেখান থেকেই রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। চিতোর দুর্গ চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত হয়। ক্রমে তা বনজঙ্গলে পূর্ণ হয়ে যায়।

যাই হোক, উপরিউক্ত এই সব ঘটনা ও তার আলোচনা থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে, বিশেষ একটা রাজনৈতিক ভাবাদর্শের দ্বারা চালিত হয়ে আমাদের আজকের ঐতিহাসিকরা ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস পরিবেশন না করে মনগড়া এক বিকৃত ইতিহাস পরিবেশন করে চলেছেন। এই রাজনৈতিক ভাবাদর্শকে সাধারণভাবে কংগ্রেসী বা নেহরু-মার্কা ভাবাদর্শ বলা হয়ে থাকে। তাই এই সব বিকৃত ইতিহাসকে নেহরু-মার্কা ইতিহাস বলা চলতে পারে।

এই নেহরু মার্কা বিকৃত ইতিহাসের কয়েকটা বিশেষ দিগ্‌নির্দেশ আছে, যেমন—(১) মুসলমান শাসনের যুগকে পরাধীনতার যুগ বলা চলবে না, কারণ ঐ সব মুসলমান শাসকরা এদেশেই থেকে গিয়েছিল, (২) মুসলমান শাসনের যুগকে ভারতের ইতিহাসের সুবর্ণযুগ বলে প্রচার করতে হবে, (৩) ইসলামের প্রকৃত কদর্য রূপ সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করা যাবে না, এবং ইসলামকে উদার, মানবিক ও সহনশীল ধর্ম বলে প্রচার করতে হবে, (৪) পক্ষান্তরে হিন্দু ধর্মকে জাতিভেদ প্রথার দ্বারা কলঙ্কিত ও অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে দেখাতে হবে, (৫) বিদেশী মুসলমান শাসকরা অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত ও উদার ছিল এবং বীরত্বে তারা হিন্দুদের থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল দেখাতে হবে, (৬) মুসলমান শাসনের যুগে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই সদ্ভাব ছিল দেখাতে হবে এবং এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বর্তমান ঘৃণা ও বিদ্বেষ

ইংরাজদের সৃষ্টি বলে প্রচার করতে হবে, (৭) মুসলমান শাসকরা হিন্দুদের ওপর যে জঘন্য অত্যাচার চালিয়েছে, তাদের হত্যা করেছে, তাদের মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করেছে এবং বলপূর্বক তাদের ধর্মান্তরিত করেছে, এসব কথা কোথাও লেখা চলবে না এবং (৮) প্রচার করতে হবে যে, বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এবং ইসলামের উদার ও মানবিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা দলে দলে মুসলমান হয়েছে।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কেন আমাদের আজকের ঐতিহাসিকরা শেরশাহের রাস্তা তৈরির আষাঢ়ে গল্প লিখে চলেছেন বা কেন তাঁরা শেরশাহের মধ্যে পৃথিবীর সব রকম সদ্‌গুণের সমাবেশ ঘটাচ্ছেন। কেন তাঁরা আকবরকে অশোকের সমান মহামতি বানাচ্ছেন বা শাহজাহানকে মানুষরূপী দেবতায় পরিবর্তিত করছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, কেন তাঁরা প্রচার করছেন যে মহামতি আকবর রাজস্থান জয় করে সমস্ত ভারতবর্ষকে একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শয়তান রানা প্রতাপ সেই মহান প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দিয়েছেন। অথবা মহান ঔরঙজেব মহারাষ্ট্র জয় করে সমস্ত ভারতকে এক করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অতিশয় দুরাত্মা, পার্বত্য মূষিক, শিবাজী সেই মহান প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দিয়েছেন।

কাজেই উপরিউক্ত দিগ্‌নির্দেশকে সামনে রেখে আমাদের ঐতিহাসিকরা যে ইতিহাস রচনা করে চলেছেন, তাতে ভারতবর্ষের প্রকৃত চিত্র কখনই প্রতিফলিত হতে পারে না। তাঁরা যে সমস্ত গবেষণা করে চলেছেন তাকেও নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধান বলা চলে না। এই সব গবেষণার উদ্দেশ্য হল, সত্যকে বিকৃত করে তাকে উল্লিখিত ভাবাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার এক ঘৃণ্য অপচেষ্টা। এই অপচেষ্টার অঙ্গ হিসাবেই তাঁরা দেশরক্ষাকারী, দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকারী হিন্দু বীর যোদ্ধাদের ভীরু কাপুরুষ হিসাবে এবং আক্রমণকারী লম্পট মুসলমান বর্বরদের বীর যোদ্ধা হিসাবে তুলে ধরেন। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা ভাল বোঝা যাবে।

পাঞ্জাবের গক্কর (বা খক্কর) জাতির লোকেরা ছিল খুবই স্বাধীনচেতা। মুসলমানরা অনেক চেষ্টা করেও কোনদিন তাদের সম্পূর্ণভাবে বাগে আনতে পারেনি। তাই দেখা যায় যে, সকল মুসলমান বাদশাকে দিল্লীর

মসনদে বসেই পাঞ্জাবে ছুটতে হয়েছে গক্কর জাতির বিদ্রোহ দমন করতে।

দস্যু মহম্মদ ঘোরী অনেক চেষ্টায়, অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে গক্করদের সাময়িকভাবে বশে আনতে সমর্থ হয়, কিন্তু সে ভারত ত্যাগ করে গজনীতে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গক্কররা পরাধীনতার দাসত্বকে ছুঁড়ে ফেলে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সাধারণ বুদ্ধি বলে যে, আমাদের ঐতিহাসিকদের উচিত তাদের এই বীরত্ব ও স্বাধীনতাপ্রিয়তাকে তুলে ধরা। কিন্তু ঐতিহাসিক অতুলচন্দ্র রায় লিখছেন, "ঘোরীর পূর্বশত্রু পাঞ্জাবের খক্কর জাতি রায়শালের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়। বিদ্রোহিগণ ঝিলাম ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে নির্বিবাদে লুটতরাজ চালাইয়া যাইতে থাকে। উহারা লাহোর লুণ্ঠন করিয়া গজনী ও পাঞ্জাবের মধ্যে সকল প্রকার যোগাযোগ ছিন্ন করে। এই অবস্থায় মহম্মদ ঘোরী ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে সসৈন্যে গজনী হইতে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি খক্করগণকে কঠোর হস্তে দমন করেন। বিদ্রোহ দমন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে পথে আততায়ীর হস্তে নিহত হন (১২০৬ খ্রীঃ)।"[38]

উপরের এই কথাগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটা অসৎ প্রচেষ্টা নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমতঃ, বীর ও স্বাধীনচেতা গক্কর জাতিকে অসভ্য, উচ্ছৃঙ্খল লুণ্ঠনকারী হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং প্রকৃত লুণ্ঠনকারী বর্বর মুসলমান আক্রমণকারীকে ভদ্র সভ্য দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। দেখানো হয়েছে সুদক্ষ শাসক বলেই মহম্মদ ঘোরীর পক্ষে গক্কর জাতিকে বশে আনা সম্ভব হয়েছে। কাজেই ধরে নেওয়া যায় যে, এই সব ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সূর্য সেন, এঁরাও উচ্ছৃঙ্খল ও অসভ্য ছিল এবং বৃটিশ জাতি সুসভ্য ছিল বলেই তাদের দমন করতে পেরেছিল। এই সব ঐতিহাসিকদের ধিক্কার জানাবার মত সঠিক শব্দ বাংলা ভাষায় আছে বলে মনে হয় না। তবে বলা চলে যে, দেশবাসীর থুতুতে ডুবে মরাই এই সব ঐতিহাসিকদের কপালে লেখা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, মহম্মদ ঘোরী যে গক্করদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে গজনীতে ফিরে যেতে বাধ্য হয় সেই বিষয়টাকে বিকৃত করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ, তিনজন অসম সাহসী রাজপুত বীরের হাতে যে মহম্মদ ঘোরীর মত পাষণ্ডের ভবলীলা সাঙ্গ হয়, সে কথাটা সযত্নে

(38) Atul Chandra Roy, ibid, I, 34.

এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। মুসলমান লিপিকার হাসান নিজামৎ এই ঘটনা বর্ণনা করতে লিখছেন, "Here he was engaged in his evening prayer, some impious (i.e. Hindu) men (God's curse and destruction on them) came running like the wind towards his majesty, the king of the world and spot killed two armed attendants and two chamber sweepers. They then surrounded the king's own tent and one or two men out of these three or four conspirators, ran towards the king and inflicted five or six desperate wounds upon the lord of seven climes."[39] —অর্থাৎ, "মহম্মদ ঘোরী যখন সন্ধ্যার (বা আসরের) নামাজে রত ছিল তখন কয়েকজন অপবিত্র কাফের (আল্লা তাদের অভিশপ্ত ও ধ্বংস করুন) ঝড়ের বেগে দুনিয়ার মালিকের দিকে এগিয়ে গেল। তারা দুজন সশস্ত্র রক্ষী ও দুজন ঝাড়ুদারকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করল। তারপর তারা সুলতানের খাস তাঁবুকে ঘিরে ফেলল এবং তিন কি চার জনের সেই চক্রান্তকারী দলের মধ্য থেকে দুজন তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করল এবং সপ্ত ভূখণ্ডের মালিককে পাঁচ কি ছয়টা আঘাতে মারাত্মকভাবে জখম করল।"

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ৩ বা ৪ জন হিন্দু যুবক মহম্মদ ঘোরীকে হত্যা করতে গিয়েছিল। প্রথমে তারা দুজন সশস্ত্র রক্ষীকে এবং অন্য তিন ব্যক্তিকে হত্যা করে মহম্মদ ঘোরীর তাঁবুতে ঢোকে এবং নামাজরত ঘোরীকে হত্যা করে। কাজেই হিন্দু হিসাবে হিন্দুর যে বীরত্বের কাহিনী তাদের আরও বিশদভাবে বর্ণনা করা উচিত ছিল, এক দুরভিসন্ধির দ্বারা চালিত হয়ে আমাদের মাননীয় ঐতিহাসিক মহাশয় তা উল্লেখমাত্র করলেন না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলার আছে। নিজের দেশ, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, অনুরাগ এবং স্বাভিমানই একটা জাতিকে বড় করে। জাতিকে সামনে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। তৎকালীন মুসলমান পর্যটক আল বেরুনী সেই সময়কার ভারতের হিন্দুদের মধ্যে এই গর্ব ও স্বাভিমান লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি লিখেছেন, "হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, তাদের দেশের মত দেশ নেই, তাদের রাজার মত

(39) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, II, 236

রাজা নেই, তাদের ধর্মের মত ধর্ম নেই, তাদের বিজ্ঞানের মত বিজ্ঞান নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।" কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আমাদের ঐতিহাসিক ডঃ পরমাত্মা শরণ হিন্দুর এই গর্ব ও স্বাভিমানকে হিন্দু জাতির পতনের তথা ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম কারণ বলে মনে করেন।[39A]

তাঁর মতে এই অসার গর্ববোধের জন্য হিন্দুরা ঘরকুনো হয়ে পড়ে। তারা কালাপানি পার না হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশ, তার লোকজন, তাদের ধর্ম-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তারা উদাসীন হয়ে পড়ে। ফলে তারা মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অসমর্থ হয় এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়।[39A]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল ডঃ পরমাত্মা শরণ তাঁর উপরিউক্ত বক্তব্যের মধ্যে আলবেরুনীর বক্তব্যের আংশিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কারণ সম্পূর্ণ বক্তব্য উদ্ধৃতি দিলে তাঁর অপচেষ্টা পাঠক ধরে ফেলবে, ঝুলির বিড়াল বেরিয়ে পড়বে। আলবেরুনীর যেটুকু উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার পরক্ষণেই তিনি লিখেছেন যে, হিন্দুরা মুসলমানদের যারপরনাই ঘৃণা করত এবং তাদের যবন কিংবা ম্লেচ্ছ বলত। সিংহাসনের অধিকার ও অন্যান্য স্বার্থের কারণে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে যে ছলনা, মিথ্যাচারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও হানাহানি মারামারি করত, হিন্দুরা তাকে খুবই হীন চোখে দেখত। উপরন্তু মুসলমান সমাজের নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে-সাদীকেও হিন্দুরা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত। তাই আলবেরুনীর মন্তব্য হল, এই সব কারণে কোন হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করে মুসলমান করা খুবই কঠিন কাজ ছিল।

আলবেরুনীর উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে এটাই পরিষ্কার হয় যে, দেশ, জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি হিন্দুর এই শ্রদ্ধা ও স্বাভিমান এবং তার থেকে উৎপন্ন মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি প্রবল ঘৃণাই হিন্দু জাতিকে, তথা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছে। এই স্বাভিমানের ফলেই হিন্দু প্রাণ দিয়েছে, অমানুষিক নির্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করেছে, কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করেনি। এই কারণেই ৭০০/৮০০ বছর সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করেও মুসলমানদের পক্ষে ১১ শতাংশের বেশী হিন্দুকে মুসলমান করা সম্ভব হয়নি।

(39A) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, V, 127.

পক্ষান্তরে এই স্বাভিমান না থাকলে ভারতবর্ষ ইরান, ইরাক বা মিশরের মত একটি ইসলামী দেশে পরিণত হত। ভারতে ১০০ শতাংশ ইসলামীকরণ সম্ভব হত এবং আমাদের সকলের নাম আবদুল, নুরুল বা মৈনুল হয়ে যেত। সব থেকে বড় কথা হল, হিন্দুর এই স্বাভিমানের জন্যই শরণের নাম আজ শ্রীপরমাত্মা শরণ আছে। অন্যথায় তিনি এত দিনে আলাউদ্দিন বা কলিমুদ্দিন বা জহিরুদ্দিন হয়ে যেতেন। মসজিদে গিয়ে নামাজ করতেন, আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিতেন এবং রমজান মাসে রোজা রাখতেন, চাচাত বা মামাত বোনকে নিকা করার অধিকার, একসঙ্গে চারটি স্ত্রী রাখার অধিকার এবং যে কোন সময় যে কোন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ঘরের বাইরে বের করে দেবার অধিকার অর্জন করতেন। জন্মলব্ধ নিজস্ব সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ করে আরবের ক্রীতদাসে পরিণত হতেন।

কজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, হিন্দুর যেই স্বাভিমানকে সর্বান্তঃকরণে প্রশংসা করা উচিত ছিল, নিজের অজ্ঞতার জন্যই হোক অথবা কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা চালিত হবার ফলেই হোক, ডঃ পরমাত্মা শরণ তার নিন্দা করে চলেছেন। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, পৃথিবীর অন্য কোন জাতি যদি তার ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করে তবে ডঃ শরণের মত ব্যক্তিরা তাতে খুশি হন এবং প্রশংসা করতে কোন কুণ্ঠাবোধ করেন না। কিন্তু হিন্দু গর্বপ্রকাশ করলেই তাঁদের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। বৃটিশ জাতি সেক্সপিয়রকে নিয়ে গর্ব করলে এঁরা বাহবা বাহবা করেন, কিন্তু হিন্দু কালিদাস, ব্যাস বা বাল্মীকির কাব্য নিয়ে গর্ববোধ করলেই এঁদের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়।

তাই এই সব ব্যক্তিদের প্রশ্ন করতে হয়—হিন্দু দর্শনের মত দর্শনশাস্ত্র পৃথিবীর আর কোন্ জাতির আছে? সংস্কৃত সাহিত্যের মত সমৃদ্ধ সাহিত্য-সম্ভার আর কোন জাতির আছে? রামায়ণ ও মহাভারতের মত মহাকাব্য পৃথিবীর আর কোন্ জাতির আছে? সংস্কৃত ভাষার মত বৈজ্ঞানিক ভাষা আর কোন্ জাতির আছে? হিন্দু-শিল্পকলার মত শিল্পকলা, হিন্দু নৃত্য-গীতের মত সঙ্গীত ও নৃত্যকলা, হিন্দুর যোগশাস্ত্রের মত শরীর চর্চার বিজ্ঞান আর কোন্ জাতির আছে? হিন্দু জাতির মত সুদীর্ঘ লিখিত ইতিহাস বা হিন্দু কালপঞ্জীর ন্যায় বৈজ্ঞানিক কালপঞ্জী পৃথিবীর আর কোন্ জাতির আছে? তাই হিন্দু যদি তার এই সু-উন্নত

এবং অত্যন্ত সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নিয়ে গর্ববোধ করে তবে তা কি অন্যায়? তা কি অযৌক্তিক?

ডাঃ পরমাত্মা শরণের হয়তো জানা নেই যে বিখ্যাত মার্কিন চিন্তাবিদ্ উইল ডুরান্ট তাঁর 'History of Civilization' গ্রন্থে হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে কি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, "India is the motherland of our race and Sanskrit is the mother of European languages. She was the mother of our philosophy mother, through the Arabs, much of our mathematics, mother through Buddha of the ideas embodied in Christianity; mother through village communities of Self Government and democracy."[39B]—অর্থাৎ, "ভারতবর্ষ সমগ্র মানব জাতির মাতৃভূমি এবং সংস্কৃত হল সমস্ত ইয়োরোপীয় ভাষাগুলির জননী। ভারত আমাদের দর্শন শাস্ত্রের মাতা; আরবদের মাধ্যমে ভারত আমাদের গণিতশাস্ত্রের মাতা, বুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারত খ্রীস্ট ধর্মের মূল তত্ত্বের মাতা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে ভারত আজকের গণতন্ত্র ও স্ব-শাসনের মাতা। "Mother India is in many ways the mother of all."—অর্থাৎ, ভারতমাতা অনেক অনেক বিষয়ে আমাদের সকলেরই মাতা।

সেই রকম জার্মান মনীষী ম্যাক্স মুলার বলেছেন, "আমি যদি সারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে এমন একটি দেশের অন্বেষণ করতে থাকি যে দেশ সম্পদ, শক্তি ও সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারে ভূষিত এবং সেই দেশের কিছু কিছু অঞ্চল মর্ত্যভূমির স্বর্গ-স্বরূপ, তাহলে আমি অবশ্যই নির্দেশ করব ভারতবর্ষ নামক দেশটির দিকে।" (Sacred Books of East)। উইলিয়ম জেমস বলেছেন, বেদের মধ্য থেকে আমরা শিক্ষালাভ করেছি শল্য চিকিৎসার প্রয়োগ পদ্ধতি, ভেষজ বিদ্যা, সঙ্গীত বিদ্যা, গৃহনির্মাণ বিদ্যা এবং সুসংবদ্ধ শিল্পকলা। জীবন, সংস্কৃতি, ধর্ম, বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, আইন, বিশ্বতত্ত্ব বিদ্যা, আবহ বিদ্যা প্রভৃতি সকল বিদ্যার বিশ্বকোষ হল ভারতীয় বেদ।" পাটীগণিত, বীজগণিত এই ভারতবর্ষই বিশ্ববাসীকে দান করেছে। ভারতবর্ষ বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছে সংখ্যা লেখার পদ্ধতি ও 'শূন্য'র ধারণা। তাই কোন হিন্দু যদি

(39B) As quoted in "Arya Sabhyatar Sandhane", By K. N Dasgupta, 70

এসব ব্যাপারে গর্ব অনুভব করে তবে সেটা কি অন্যায়?

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, বর্বর মুসলমানদের আক্রমণের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এই সনাতন ধারা পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে গেল। কোরানের কাফের-নিধন ও লুটপাটের তত্ত্ব ভারতের সনাতন সমাজব্যবস্থাকে একেবারে তছনছ করে দিল। পশুভাবাপন্ন মুসলমান হানাদার ও শাসকের দল ভারতবর্ষকে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল।

মুসলীম পরাধীনতার যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস একটু মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, যখনই কোন নতুন ব্যক্তি দিল্লীর বাদশা হয়ে বসছে, তখনই তাকে রাজ্য বিস্তারের জন্য দৌড়াতে হচ্ছে। তাকে গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যভারত ও দক্ষিণ ভারতে অভিযান করতে হচ্ছে। গোয়ালিয়র, রায়সিন, রণথম্ভোর, চিতোর ইত্যাদি দুর্গ দখল করতে হচ্ছে এবং সেই জন্য অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। কাজেই প্রশ্ন হল, কেন একই দুর্গ বা একই অঞ্চল বিভিন্ন বাদশাকে বার বার জয় করার প্রয়োজন হচ্ছে? উত্তর একটাই। মুসলমানরা কোন দুর্গ বা কোন অঞ্চলেই বেশীদিন তাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়নি। স্থানীয় ঐ সব রাজারা ক্রমাগত বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, দিল্লীর শাসনকে অস্বীকার করেছে। তাই একই অঞ্চল বাদশাদের বার বার জয় করার প্রয়োজন হয়েছে। এর থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে ভারতের হিন্দু শক্তি আক্রমণকারী মুসলমান শক্তির সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষ করেছে এবং অসংখ্য হিন্দু বীর এই সংঘর্ষে রক্ত দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে। বিদেশী মুসলমান শক্তিকে এক মুহূর্তও নিশ্চিন্তে থাকতে দেয়নি।

তাই ডঃ কে এম. মুন্সী লিখছেন, "It was one of ceaseless resistance offered with relentless heroism; of men, from boys in teens to men with one foot in the grave, fighting away their lives for freedom; of warriors defying the invaders from fortresses for months, sometimes for years, in one case, with intermission, for a century; of women in thousands courting fire to save their honour; of children whose bodies were flung into the wells by their parents so that they might escape slavery; of fresh heroes springing up to take the place

of the dead and to break the volume and momentum of the onrushing tide of invasion.''(40) —অর্থাৎ, "এ হল স্বাধীনতা রক্ষার খাতিরে নিতান্ত বালক থেকে শুরু করে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ পর্যন্ত অগণিত মানুষের বিরামহীন সংঘর্ষ, নিরন্তর বীরত্ব প্রদর্শন ও প্রাণ বিসর্জনের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। এ হল মাসের পর মাস, কখনও বা বছরের পর বছর ধরে দুর্গের অভ্যন্তরে থাকা বীর যোদ্ধাদের যুদ্ধের ইতিহাস, দুর্গ আক্রমণকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলতে থাকা এক বিরামহীন সংগ্রামের ইতিহাস। এ হল, সম্মান রক্ষার্থে হাজার হাজার হিন্দু রমণীর জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবার এক দীর্ঘ ইতিহাস। এ হল দাসত্বের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পিতামাতার দ্বারা অবোধ শিশুকে কূপের জলে নিক্ষেপ করার এক করুণ ইতিহাস। এ হল অন্তহীন হামলাকারীদের নিরন্তর আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য, দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য তরুণ যোদ্ধাদের দ্বারা মৃত সৈনিকের স্থান পূরণ করার এক বিভীষিকাময় ইতিহাস।"

ডঃ মুন্সী আরও লিখছেন, ''The people while countering the invader by armed resistance to the best of thier ability succeeded in confining his authority wherever he had acquired it, within the narrowest limits. They also tried to protect religion, culture, and social order, rebuilding on the old foundations wherever they could.....women were segregated in their homes; infant marriages became almost universal. Self-immolation by heroic women on the funeral pyre, when their husbands lost their lives in battle, became the supreme form of martyrdom.''(41)—অর্থাৎ, "এ হল আক্রমণকারীদের অধিকৃত অঞ্চলকে যথাসাধ্য সীমিত রাখার জন্য এক বিরামহীন রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস। এ হল ভগ্ন সমাজের ভিত্তির উপর সনাতন ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার, তথা ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার এক নিরন্তর সংগ্রামের ইতিহাস। এই সময় থেকেই হিন্দু নারীকে

(40) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, V, xv.
(41) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, V, xvii..

তার সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ঘরে বন্দী করে রাখার প্রথা চালু হয় এবং মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নাবালিকাদের বিবাহ দেবার প্রথা চালু হয়। মুসলমানদের দ্বারা কোন হিন্দু বিধবা যাতে কলুষিত না হতে পারে সেই কারণে মৃত যোদ্ধা স্বামীর চিতায় তাকে তুলে দেবার প্রথা বীরত্বের চরম প্রকাশ বলে স্বীকৃত হতে শুরু করে।”

আমাদের সকল ঐতিহাসিকদের কর্তব্য হল ডঃ মুন্সীকে অনুসরণ করা। যেই সব অগণিত হিন্দু বীর বছরের পর বছর ধরে বর্বর আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করেছে, দেশ-ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়েছে, সেই মরণজয়ী বীরদের বীরত্বকে, দেশপ্রেমকে দেশের জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। কোনরকম উচ্ছিষ্টের লোভে সমস্ত রকম ন্যায়নীতি ও মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর ন্যায় চালিত হয়ে বিকৃত ইতিহাস লেখা নয়। তাই তাঁদের কাছে বিনীত অনুরোধ, বিদেশী বর্বর আক্রমণকারীদের মহান প্রতিপন্ন করার বিকৃত ইতিহাস লেখা বন্ধ করুন। দেশ ও জাতির সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস দেশবাসীকে উপহার দিন। ঐতিহাসিক হিসাবে দেশ ও দশের প্রতি দায়িত্ব পালন করুন।

কুতুব মিনার না মেরুস্তম্ভ?

দিল্লীর যে এলাকায় কুতুব মিনার অবস্থিত তার নাম মেহেরৌলী। বছর দুয়েক আগে এই মেহেরৌলী সংবাদপত্রের শিরোনামে আসে। কারণ সেখানকার এক রেস্তোরাঁয় একজন মহিলা মডেল খুন হন। যাই হোক, মেহেরৌলী শব্দটি এসেছে 'মিহিরওয়ালী' থেকে এবং এই মিহির হলেন সম্রাট বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের এক রত্ন, বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহ মিহির। মিহিরওয়ালী বলতে বোঝায় বরাহ মিহিরের শিষ্যগণ বা তাঁর অনুগামিগণ। তাই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, হঠাৎ ওই জায়গাটার নাম মেহেরৌলী বা মিহিরওয়ালী হল কেন?

আজ যেখানে কুতুব মিনার দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গাটা একটু ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, চারপাশে অনেক দালান-কোঠা ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে। কোনটা পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে, শুধু ভিতটাই পড়ে আছে, কোনটার ছাদ ধসে পড়লেও দেওয়াল আজও অক্ষত রয়েছে, কোনটা আবার অনেকটাই টিকে আছে, আর এই সব দালান-কোঠার মধ্যে কুতুবমিনার দাঁড়িয়ে আছে।

কাজেই যদি অনুমান করা যায় যে, পুরো অঞ্চলটা এককালে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা ও গবেষণার কেন্দ্র ছিল এবং বরাহমিহিরের অনুগামীরা সেখানে পঠন-পাঠন ও গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিলেন, এবং আজকের কুতুব মিনার ছিল তাঁদের পর্যবেক্ষণ স্তম্ভ বা observation tower, তবে ওই সব বাড়িঘর, মিনার এবং ঐ এলাকার নামকরণের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়।

পক্ষান্তরে, সুলতান কুতুবুদ্দিন ও সুলতান আলতামস (ইলতুৎমিস) ঐ মিনার নির্মাণ করেছেন বললে তেমন কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ, কি উদ্দেশ্যে তাঁরা ঐ স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন? এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সব বিদেশী আক্রমণকারী ভারতে এসেছিল ভারতকে লুন্ঠন করতে, টাকা-পয়সা খরচ করে মিনার বা স্তম্ভ বানাতে নয়।

আল্লার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে অনেক মসজিদ তারা বানিয়েছিল ঠিকই, তবে সেই সমস্ত মসজিদও তারা মন্দির ভেঙে তার মাল-মশলা দিয়েই তৈরি করেছিল। অথবা সাবেক মন্দিরের কিছুটা রদবদল করে তাকে মোটামুটি ভাবে একটা মসজিদে রূপান্তরিত করেছিল মাত্র। সম্পূর্ণ নতুনভাবে নতুন মালমশলা দিয়ে তারা যে সব মসজিদ বানিয়েছিল তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। প্রায় নেই বললেই চলে। কাজেই এই সব আক্রমণকারী দখলদাররা টাকা পয়সা খরচ করে একটা মিনার নির্মাণ করেছে, একথা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন।

অন্য দিকে, বিভিন্ন হিন্দু গ্রন্থে যে সব তথ্যাদি আছে, তা থেকে অনেকে মনে করেন যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব-কালেই (৩৮০ থেকে ৪১৩ খ্রীস্টাব্দ) বরাহমিহির ওই স্তম্ভ তৈরি করেন। তখন তার নাম ছিল 'মেরুস্তম্ভ'। আগেই বলা হয়েছে যে, বরাহমিহির ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের এক রত্ন। তিনি ছিলেন জ্যোতির্বিদ্যার বিখ্যাত গ্রন্থ 'পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা'র প্রণেতা। আরও বড় কথা হল, বরাহমিহির সংস্কৃত 'অহোরাত্র' শব্দের প্রথমের অ ও শেষের ত্র বাদ দিয়ে 'হোরা' (hora) নামে সময়ের একটি নতুন একক সৃষ্টি করেন এবং ২৪ হোরায় ১ দিনরাত্রি মাপা চালু করেন। পণ্ডিতদের মতে এই হোরা থেকেই ইংরাজী hour শব্দ এসেছে এবং বরাহমিহিরকে অনুসরণ করেই আজ সারা বিশ্বে ২৪ ঘণ্টায় ১ দিনরাত্রি গণনা করা হচ্ছে। কাজেই সেই বরাহমিহিরের পক্ষে একটা পর্যবেক্ষণ স্তম্ভ নির্মাণ করা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকরা লিখছেন যে, কুতুবুদ্দিন আইবক দিল্লীর শাসনকর্তা হিসাবে ১১৯৩ সালে দিল্লী আসেন এবং ১২০৬ সালে কুতুবমিনার নির্মাণের কাজ শুরু করেন। কিন্তু মৃত্যুর (১২১০ খ্রীঃ) আগে মাত্র একতলা পর্যন্ত তৈরি করতে সক্ষম হন। পরে তাঁর জামাতা আলতামস এর নির্মাণ কার্য শেষ করেন। মূল নক্‌শা অনুযায়ী তা ২২৫ ফুট উঁচু করা হয় এবং চারটি তলায় ভাগ করা হয়।[42] আমাদের ঐতিহাসিকদের মতে, নামাজের আগে আজান দেবার জন্যই মুসলমানরা ওই মিনার তৈরি করে।[42]

মুসলমানরাই যে ওই মিনার তৈরি করেছেন তার প্রমাণ কি? আমাদের ঐতিহাসিকরা প্রমাণ হিসাবে বলেন যে, জন মার্শাল তাঁর

(42) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VI, 668

'Monuments of Muslim India' গ্রন্থে লিখে গেছেন, ''The whole conception of the minar and almost every detail of its construction and ornamentations is essentially Islamic. Towers of this kind were unknown to the Indians, but to the Muhammadans they had long been familiar, whether as mazinas attached to mosque or as free standing towers like those at Ghazni.''(43) —অর্থাৎ, "মূল পরিকল্পনা থেকে শুরু করে এই মিনারের গঠন ও অলঙ্করণ সর্বাংশে ইসলামী। মসজিদে আজান দেবার জন্যই হোক, আর গজনীর মিনারের মত স্বতন্ত্র এক মিনারই হোক, একমাত্র মুসলমানরাই এই ধরনের মিনারের সঙ্গে পরিচিত ছিল। হিন্দুদের কাছে এ ধরনের মিনার ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত।" কিন্তু মুশকিল হল, সেই John Marshall-এর দেশেরই আরেক পণ্ডিত Arthur Upham Pope বলে গেছেন যে, পশ্চিম এশিয়ার নিজস্ব কোন স্থাপত্যশৈলী নেই। যে সমস্ত স্থাপত্যশৈলীকে তারা তাদের নিজস্ব বলে দাবি করে, তা সবই এক সময় ভারত থেকে সেখানে গিয়েছে।(44)

এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক এস. কে. সরস্বতী লিখছেন, ''Arthur Upham Pope has ably demonstrated how Indian (or Hindu) ideas in art and architecture migrated to Western Asia and reached concrete forms under the technical ingenuity of the persian builders. Indeed, many of the fundamental forms of Persian architecture, such as the pointed and trefoil arches, the transverse vault, the octagonal form of the building, the dome etc. were originated in India.....It is through such cultural contacts that art in the west acquired substance and individuality which the establishment of Islam could hardly change or alter.''(44)— —অর্থাৎ, "কেমন করে ভারতীয় বা হিন্দু স্থাপত্যের বিভিন্ন কল্পনা পশ্চিম এশিয়াতে যায় এবং বিশেষ করে পারস্যের কলাকুশলীদের দ্বারা

(43) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VI, 669.
(44) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VI, 661.

ক্রমে তা বিশেষ রূপ পায় তা আর্থার উপহ্যাম পোপ খুব সাফল্যের সঙ্গেই প্রমাণ করে গিয়েছেন। বাস্তবিকপক্ষে কৌণিক খিলান, অষ্টকোণযুক্ত সৌধ এবং গম্বুজ ইত্যাদি ভারতের হিন্দু স্থপতিরাই আবিষ্কার করেন, কিন্তু আজ তা ইরানী স্থাপত্য নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে শিল্পের আদান-প্রদানের মাধ্যমে ইসলামের অভ্যুদয়ের বহু পর্বেই ঐ সব স্থাপত্য-কলা ভারত থেকে পশ্চিমে চলে যায়, যার ওপর কোন প্রভাব ফেলা ইসলামের পক্ষে ছিল নিতান্তই অসম্ভব।" সুতরাং Arthur Upham সাহেবের উপরিউক্ত মন্তব্য মেনে নিলে এটাই বলতে হয় যে, পার্শী বা তুর্কী, অথবা এক কথায় ইসলামী স্থাপত্য বলে আজ যা চলছে তাকে ভারতীয় বা হিন্দু স্থাপত্য না বলার কোন উপায় থাকে না।

কাজেই John Marshall-এর মন্তব্য, "The whole conception of the minar...is Islamic." অর্থহীন হয়ে পড়ে। মিনারের সমস্ত স্থাপত্য কর্মকে হিন্দু স্থাপত্য বলেই স্বীকার করে নিতে হয়। এখানে উল্লেখ করার বিষয় হল, যেই দেশে ইসলামের অভ্যুদয় হয়েছে, সেই আরব দেশের নিজস্ব কোন স্থাপত্যশৈলী নেই। পরবর্তিকালে আরবরা যখন ইরান, ইরাক ও তুরস্ক জয় করল তখন সেই সব বিজিত দেশগুলোর সাবেক স্থাপত্যশৈলীই ইসলামী স্থাপত্যশৈলী বলে নাম পেল। এবং Arther Upham-এর মতে ইরান, ইরাক ও তুরস্কের সাবেক স্থাপত্যশৈলীর জননী হল হিন্দু স্থাপত্য। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আজ যা ইসলামী বা saracenic স্থাপত্য বলে অভিহিত হয়ে চলেছে তা মূলতঃ হিন্দু স্থাপত্যই বটে।

এখানে আরও একটা বিষয় বলার আছে। জন মার্শাল কুতুব মিনারের সঙ্গে গজনীর মিনারের সাদৃশ্য থেকে প্রমাণ করতে চাইছেন যে কুতুব মিনারের গঠনশৈলী নিঃসন্দেহে ইসলামী। কিন্তু প্রশ্ন হল, গজনীর মিনার যে মুসলমানরাই তৈরি করেছে তার প্রমাণ কি? অনেকের মতে গজনীর মিনার প্রাক্-ইসলামী যুগের তৈরি এবং সেই কারণে তার স্থাপত্যশৈলীও নির্ভেজাল হিন্দু। ভবিষ্যতের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান যদি গজনীর মিনারকে প্রাক্-ইসলামী যুগের তৈরি বলে প্রমাণিত করতে পারে তবে Arther Upham-এর সিদ্ধান্তই সঠিক বলে প্রমাণিত হবে। এবং সেক্ষেত্রে কুতুব মিনারের স্থাপত্যকে অবশ্যই হিন্দু স্থাপত্য বলে মেনে নিতে হবে।

সাবেক অবস্থায় কুতুব মিনার বা মেরুস্তম্ভের চারদিকে ২৭টি নক্ষত্রের নামে ২৭টি মন্দির ছিল।[45] এ ছাড়া মেরুস্তম্ভের প্রায় আধ মাইল দূরে আরও একটি মন্দির ছিল, যাকে বলা হত ২৮ নক্ষত্রের মন্দির।[46] এই ২৮ নক্ষত্রের মন্দিরটিই ছিল সব থেকে বড়।[46] যাই হোক, এই সব মন্দিরগুলোতে দেবদেবী-রূপী নক্ষত্রদের মূর্তি ছিল। মুসলমানদের ধর্মে মূর্তি তৈরি করা এবং পূজা করা জঘন্যতম পাপ।[47] তাই সুলতান হয়ে দিল্লীতে পা দিয়েই কুতুবুদ্দিন তার দলবল নিয়ে মেহেরৌলীতে মূর্তি ভাঙতে ছুটল। সব মন্দির ও মূর্তি ভাঙা হল এবং সেই সব মালমশলা দিয়ে মেরুস্তম্ভের কাছে 'কুতুব-উল-ইসলাম' মসজিদ তৈরি করা হল। এই মসজিদের গায়ে কুতুবুদ্দিনের যে শিলালিপি আছে, তাতে এই সব ঘটনার কথা লেখা আছে। প্রধান ফটক থেকে চন্দ্ররাজার লৌহস্তম্ভে যাবার পথে যে বড় কৌণিক খিলান রয়েছে, তার গায়ে একটা শিলালিপিতেও এসব ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়।[48]

সেই সময় কুতুবুদ্দিন তার অনুচরদের ওই মিনারের কথা জিজ্ঞাসা করে। অনুচরেরাও ওই মিনারকে মেরুস্তম্ভ বলেই জানত। তাই তারা জবাবে বলল যে, এর নাম 'কুৎব মিনার'। 'কুৎব মিনার' আরবী কথা, যার আক্ষরিক অর্থ হল 'মেরুস্তম্ভ' বা বিশেষ অর্থে 'উত্তর-মেরু স্তম্ভ'। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কালক্রমে এই 'কুৎব মিনারের' সঙ্গে খুব সহজেই কুতুবুদ্দিনের নাম জুড়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এবং তাও করা হয়েছে কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর প্রায় ২০০ বছর পরে শামস-ই-সিরাজ নামক এক মুসলমান লিপিকারের দ্বারা।[49]

এখানে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। সুলতান কুতুবুদ্দিনের জীবনীকার হাসান নিজামী তাঁর 'তাজ-উল-মাসির'

---

(45) এই ২৭টি নক্ষত্রের নাম অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব ফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বষাঢ়া, উত্তরষাঢ়া, অভিজিৎ, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূঃ ভাদ্রপদ, এবং উঃ ভাদ্রপদ। এদের সঙ্গে ধ্রুবতারা যোগ করলে ২৮ নক্ষত্র হয়। (46) Acharya Bapu Vankar, Itihas Darpan, New Delhi, III (1996), ii, 56. (47) বর্তমান লেখকের 'ইসলামী ধর্মতত্ত্বঃ এবার ঘরে ফেরার পালা', 'নামাজ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (48) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 662. (49) P. N. Oak, Islamic Havoc In Indian History, 120.

গ্রন্থে বলছেন যে, কুতুবুদ্দিন দিল্লীতে এসে অনেক মন্দির ভেঙেছে এবং তার মাল-মশলা দিয়ে মসজিদ তৈরি করেছে। "Kutub-ud-din built the Jam-i-Masjid at Delhi and adorned it with the stones and gold obtained from temples which had been demolished by elephants and covered it with inscriptions in Toghra containing the divine commands."(50) —অর্থাৎ, "কুতুবুদ্দিন দিল্লীতে জাম-ই-মসজিদ নির্মাণ করেন এবং হাতীর সাহায্যে যে সব মন্দির ভাঙা হয়েছিল সেই সব মন্দির থেকে আনা দামী পাথর ও সোনা দিয়ে তিনি সেই মসজিদকে সুসজ্জিত করেন। টোঘরা অক্ষরে কোরানের বাণীও তার গায়ে উৎকীর্ণ করেন।" এছাড়া বেনারস জয় করে কুতুবুদ্দিন যে ১০০০ মন্দির ধ্বংস করেছিল (এখানে ধ্বংস বলতে মাল-মশলা দিয়ে মসজিদ তৈরি বুঝতে হবে) তাও 'তাজ-উল-মাসির'-এ আছে। কিন্তু কুতুবুদ্দিন যে কোথাও কোন মিনার তৈরি করেছে যে কথা 'তাজ-উল-মাসির'-এ নেই।

আরও একটি গ্রন্থ থেকে কুতুবুদ্দিন ও আলতামসের সময়কার ইতিহাস পাওয়া যায়, তা হল মিনহাজ-উস-সিরাজ রচিত 'তাবাকৎ-ই-নাসিরি'। এই গ্রন্থেও, কুতুবুদ্দিন মিনার তৈরি করতে শুরু করেছে এবং আলতামস তা শেষ করেছে, এমন কোন উল্লেখ কোথাও নেই। সুলতান কুতুবুদ্দিন এত বড় একটা মিনার তৈরি করার মত বিরাট এক কাণ্ড করল, কিন্তু তা তার স্তাবক ঐতিহাসিক ও লিপিকারদের চোখে পড়ল না, তা হতে পারে না।

John Marshall ও আমাদের ঐতিহাসিকদের মতে, নামাজের আগে আজান দেবার জন্যই কুতুবুদ্দিন ঐ মিনার তৈরি করেছেন। কাজেই ধরে নিতে হয় যে, ২৮ নক্ষত্রের মন্দির ভেঙে যে 'কুতুব-উল-ইসলাম' মসজিদ কুতুবুদ্দিন তৈরি করেছিল, সেই মসজিদের আজানের জন্যই কুতুব মিনার তৈরি করা হয়েছিল, কারণ মিনারের কাছাকাছি আর কোন মসজিদ নেই। এই যুক্তি মেনে নেওয়া চলত, কিন্তু তাতে মসজিদ ও তার আজান দেবার মিনারের অসামঞ্জস্য হাস্যকর হয়ে পড়ে। ঘোড়ার চেয়ে চাবুকের দাম বেশী হয়ে পড়ে।

এখানে আরও একটা বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। মসজিদই হল মূল কাঠামো এবং মিনার তার একটা অঙ্গমাত্র। আজান দেওয়ার চেয়েও

(50) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, II, 222.

চাঁদ দেখার জন্য ওই মিনার বেশী ব্যবহৃত হয। সাধারণতঃ ওই মিনার মসজিদের গায়েই তৈরি করা হয়ে থাকে, যাতে করে মিনার থেকে মসজিদ এবং মসজিদ থেকে মিনারে সরাসরি যাতায়াত করা যায়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে কুতুব মিনার ও কুতুব-উল-ইসলাম মসজিদের মধ্যে দূরত্ব এত বেশী যে, কুতুব মিনারকে কখনই কুতুব-উল-ইসলাম মসজিদের অঙ্গ বলা চলে না। কোন মুসলমান আলিমও তা স্বীকার করবেন বলে মনে হয় না। এর চেয়েও বড় কথা হল, সুলতান কুতুবুদ্দিন মন্দির ভেঙে সেই মাল-মশলা দিয়ে প্রায় নি-খরচায় মসজিদ তৈরি করলেন আর পকেট থেকে টাকা খরচ করে সেই মসজিদের জন্য অতবড় একটা মিনার তৈরি করলেন, এ যুক্তি সম্পূর্ণ হাস্যকর।

আমাদের ঐতিহাসিকরা আরও একটা কথা বলে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, কুতুবুদ্দিন ও আলতামস দুজনেই শিল্প ও স্থাপত্যের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং তাই তাঁরা ওই মিনার নির্মাণ করেছেন। কিন্তু এই দুই সুলতানের ব্যক্তিগত জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তা এতই কদর্য ও লাম্পট্যপূর্ণ ছিল যে, ওই ধরনের লোকের মধ্যে শিল্পানুরাগ থাকা খুবই কষ্টকল্পনা।

আমাদের ইতিহাস বইগুলো বলছে যে, কুতুবুদ্দিনের দিল্লীর মসনদে বসার মধ্য দিয়ে দিল্লীতে দাসবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ কুতুবুদ্দিন ছিল মহম্মদ ঘোরীর একজন ক্রীতদাস। আবার-পরবর্তী সুলতান আলতামস ছিল কুতুবুদ্দিনের ক্রীতদাস। পরে কুতুবুদ্দিন আলতামসের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেয় এবং কোন পুত্র সন্তান না থাকায় কুতুবুদ্দিন মারা গেলে আলতামস দিল্লীর সুলতান হয়। কিন্তু কি কারণে মহম্মদ ঘোরী কুতুবুদ্দিনের মত একজন ক্রীতদাসকে ভারতের বিজিত সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছিলেন? আমাদের ঐতিহাসিকরা বলেন যে, মহম্মদ ঘোরীর কোন পুত্রসন্তান ছিল না, এটাই কারণ। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড় একটা কারণ ছিল যা আমাদের ঐতিহাসিকরা এড়িয়ে চলেন।

তখনকার দিনে ধনী ও অভিজাত মুসলমানরা সমকাম বা পায়ুকাম চরিতার্থ করতে অল্পবয়সী ক্রীতদাস বালক কিনত। সেই উদ্দেশ্যেই মহম্মদ ঘোরী বালক কুতুবুদ্দিনকে ক্রীতদাস হিসাবে কিনেছিলেন। কুতুবুদ্দিন জাতিতে তুর্কী ছিল। তাবাকৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থ থেকে জানা যায়

যে নৈশপুর (ভাগবতের নৈমিশারণ্য ?)-এর ক্রীতদাসের হাট থেকে এক কাজী প্রথমে তাকে ক্রয় করে। সেই কাজীর নাম ছিল ফকরুদ্দিন আবদুল আজিজ।[51] সেই কাজীর বাড়ীতে কুতুবুদ্দিন কোরান পড়া, ঘোড়ায় চড়া ও ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করে। একটু বড় হলে এক বণিক তাকে কিনে গজনীতে নিয়ে আসে, মহম্মদ ঘোরী তার কাছ থেকে কুতুবুদ্দিনকে কিনে নেয়। 'আইবক' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল, শারীরিক খুঁৎ-যুক্ত ব্যক্তি। কুতুবুদ্দিনের হাতের একটা আঙুল ভাঙা ছিল, এই কারণে তার নামের শেষে আইবক লেখা হয়।

কুতুবুদ্দিনের চেহারা ও শারীরিক গঠন ছিল খুবই সুন্দর। এই কারণে লম্পট মহম্মদ ঘোরী তার প্রতি খুবই আসক্ত হয়ে পড়ে। যেমন করে একজন স্ত্রৈণ ব্যক্তি স্ত্রীর বাধ্য হয়, মহম্মদ ঘোরীও ক্রমে কুতুবুদ্দিনের বাধ্য হয় পড়ে। কুতুবুদ্দিনও তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এবং তার আবদার রক্ষা করতে মহম্মদ ঘোরী তাকে নানারকম সরকারী কাজে নিয়োগ করতে থাকেন। এইভাবে শেষ পর্যন্ত মহম্মদ ঘোরী তাকে আস্তাবলের প্রধান রক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। এই পদে নিযুক্ত হবার পর থেকেই সে বিভিন্ন অভিযানে যোগ দেবার সুযোগ পায়। কারণ অভিযান হলে আস্তাবল সঙ্গে যাবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কুতুবুদ্দিনকেও যেতে হবে।

এইভাবে কুতুবুদ্দিন সর্বপ্রথম খোরাসান অভিযানে সঙ্গী হয়। ভারত অভিযানের সময়ও সে ভারতে আসে এবং ১১৯২ সালে তরাইনের যুদ্ধে যুদ্ধ করে। আরও অনেকগুলো অভিযানে যোগ দিয়ে সে কাফের-নিধন, মন্দির ধ্বংসকরণ, লুণ্ঠন ইত্যাদি ইসলামের সমস্তরকম দানবীয় কাজে হাত পাকায়। পুরোপুরি দস্যু হয়ে ওঠার পুরস্কার হিসাবে মহম্মদ ঘোরী গজনীতে ফিরে যাবার সময় প্রিয় ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিনকে ভারতে বিজিত অঞ্চলগুলির শাসনকর্তা নিযুক্ত করে যান। এরপর ১২০৬ সালে মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হলে সে নিজেকে হিন্দুস্থানের সুলতান ঘোষণা করে।

কুতুবুদ্দিন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মিনহাজ-উস-সিরাজ তাঁর 'তাবাকৎ-ই-নাশিরি গ্রন্থে লিখছেন।" "Sultan Kutub-ud-din, the second Hatim, was a brave and liberal

(51) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, II, 299.

king . The Almighty had bestowed on him such courage and generosity that in his time there was no king like him from the east to the west''.—অর্থাৎ, "সুলতান কুতুবুদ্দিন ছিলেন যেন দ্বিতীয় এক হাতিম তাই, একজন সাহসী ও উদার নরপতি। সর্বশক্তিমান আল্লা তাকে দিয়েছিলেন অকৃপণ সাহস ও বদান্যতা। ফলে সেই সময় পূর্ব থেকে পশ্চিমে, তার মত সুলতান একজনও ছিল না।" So this king was generous and brave and all the regions of Hindustan were filled with friends and cleared of foes. His bounty was continuous and his slaughter was continuous.''[52] —অর্থাৎ, কুতুবুদ্দিন হিন্দুস্থানকে বন্ধুতে অর্থাৎ মুসলমানে পরিপূর্ণ করেছিল এবং শত্রু অর্থাৎ হিন্দুশূন্য করেছিল। ''his bounty was continuous and his slaughter was continuous'' বলতে বুঝতে হবে যে, হিন্দুনিধন ও হিন্দুর সম্পত্তি লুঠপাটে তার কোন বিরাম ছিল না।

১২৯৪ সালে মহম্মদ ঘোরী কুতুবুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে রাজা জয়চাঁদের বিরুদ্ধে বেনারস অভিযান করেন। পথে জুন মাসে তাঁরা 'কোল' নামক স্থান দখল করে এবং লুটপাট চালায়। এই বর্বরতা বর্ণনা করতে হাসান নিজাম তাঁর 'তাজ-উল-মাসির' গ্রন্থে লিখছেন, ''By the edge of the sword they (Hindus) were despatched to the fire of hell. Three bastions were raised as high as heaven with their heads and their carcasses became the food of beasts of prey.''[53]—অর্থাৎ, "তার তরবারির ধার সমস্ত হিন্দুকে নরকের আগুনে নিক্ষেপ করল। তাদের কাটা মুণ্ড দিয়ে আকাশ সমান উঁচু তিনখানা বুরুজ (বা গম্বুজ) নির্মাণ করা হল এবং কবন্ধগুলো বন্য পশুর খাদ্যে পরিণত হল।" সেই একই ঘটনা মিনহাজ তাঁর 'তাবাকৎ-ই-নাসিরি'তে বর্ণনা করছেন, ''Those of the garrison who were wise and acute were converted to Islam, but those who stood by their ancient faith were slain.''—অর্থাৎ, "সেনাদের মধ্যে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল, আর যারা সনাতন ধর্ম

(52) H. M. Elliot and Ja Dowson, ibid, II, 298.
(53) H. M. Elliot and Ja Dowson, ibid, II, 224.

ত্যাগ করতে অস্বীকার করল, তাদের সবাইকে হত্যা করা হল।"[54]

সেখান থেকে কুতুবুদ্দিন ১০০০ ঘোড়সওয়ার বিশিষ্ট বাহিনী নিয়ে কাশীর দিকে অগ্রসর হয় এবং পথে অসনি দুর্গ অধিকার করে লুটপাট চালায়। মিনহাজ লিখছেন, ''Immense booty was obtained such as the eye of the beholder would be weary to look at.''—অর্থাৎ, "সেখানে এত লুটের মাল পাওয়া গেল যে তা দেখতে দর্শনকারীর চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ল।" এর পর জয়চাঁদের সঙ্গে কুতুবুদ্দিনের যুদ্ধ হয়। জয়চাঁদ হাতীর পিঠে চড়ে যুদ্ধ করছিলেন। হঠাৎ একটা তীর এসে তাঁকে মারাত্মক ভাবে আঘাত করে। জয়চাঁদ হাতীর পিঠ থেকে পড়ে যান। হিন্দু বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। মুসলমানরা বেনারস দখল করে।

কাশী নগরী দখল করার পর কুতুবুদ্দিন মুসলমানদের আদেশ দিল হিন্দু মন্দির ধ্বংস করতে। মিনহাজ তা বর্ণনা করে লিখছেন, ''They destroyed nearly one thousand temples and raised mosques on their foundations.''[55]—অর্থাৎ, "তারা প্রায় এক হাজার মন্দির ধ্বংস করল এবং সেই সব মন্দিরের ভিতের ওপর মসজিদ নির্মাণ করল।" সেখান থেকে কুতুবুদ্দিন চলে গেল আজমীর। সেখানকার ধ্বংসলীলা বর্ণনা করে মিনহাজ লিখছেন, ''Religion (i.e. Islam) was established, the road of rebellion was closed, infidelity was cut off and foundation of idol worship were utterly destroyed.''[56] —অর্থাৎ, "সেখানে ধর্ম (ইসলাম) প্রতিষ্ঠিত হল, বিদ্রোহের পথ বন্ধ হল, বিধর্মী কাফেরদের প্রাধান্য রুদ্ধ হল এবং মূর্তিপূজার সমস্ত প্রতিষ্ঠান (অর্থাৎ মন্দির) নির্মমভাবে ধ্বংস করা হল।"

এর পর ১১৯৬ সালে কুতুবুদ্দিন গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণ করে এবং মিনহাজ লিখছেন, ''In compliance with the divine (i.e. Koranic) injunctions of holy war (jehad), they drew out the bloodthirsty sword before the faces of the enemies of religion (i.e. Hindus).''[56]—অর্থাৎ, "কোরান বর্ণিত পবিত্র জিহাদের বাণী অনুসরণ করে তারা তাদের রক্ত-

(54) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, II, 222.
(55) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, II, 223.
(56) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, II, 227.

পিপাসু ইসলামের তরবারি খাপ থেকে বার করে ধর্মের শত্রুদের (অর্থাৎ হিন্দুদের) সামনে তুলে ধরল।" ওই একই ঘটনা বর্ণনা করতে হাসান নিজামি তাঁর 'তাজ-উল-মাসির'এ লিখছেন, ''The army of Islam was completely victorious and an hundred thousand grovelling Hindus were swiftly despatched to the hell of fire....He destoryed the pillars and foundation of the idol temples and built in their stead mosques and colleges and precepts of Islam.''(57) —অর্থাৎ, "ইসলামের সেনারা সম্পূর্ণভাবে বিজয়ী হল এবং ১,০০,০০০ কাফের হিন্দুকে তৎক্ষণাৎ নরকের আগুনে পাঠিয়ে দেওয়া হল।.........সে মূর্তিপূজার সমস্ত কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানকে (অর্থাৎ মন্দিরকে) ধ্বংস করল এবং সেখানে ইসলামের নিদর্শন স্বরূপ মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করল।"

১১৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে কুতুবুদ্দিন ও মহম্মদ ঘোরী গুজরাট অভিযান করে এবং পথে নাহরওয়ালা দুর্গ আক্রমণ করে। মাউন্ট আবুর এক গিরিপথে রাজা করণ সিং ও মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে করণ সিং হেরে যান এবং মিনহাজ লিখছেন, ''Nearly fifty thousand infidels were despatched to hell by the sword and from the leaps of the slain the hills and the plain became one level...More than twenty thousand slaves and twenty elephants and cattle and arms beyond all calculation, fell into the hand of the victors.''(58)—অর্থাৎ, "প্রায় ৫০,০০০ বিধর্মী কাফেরকে তরবারির সাহায্যে নরকের আগুনে চালান করা হল এবং তাদের শবদেহের স্তূপ পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে গেল।....বিশ হাজারেরও বেশী ক্রীতদাস, কুড়িটি হাতী সহ এত লুটের মাল বিজয়ীদের হাতে এল, যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।"

১২০২ সালে কুতুবুদ্দিন কালিঞ্জর দুর্গ আক্রমণ করে। ক্রীতদাস আলতামস তার সঙ্গী হয়। রাজা অজদেও ও মুসলমান বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। এরপর কুতুবুদ্দিন দুর্গ অবরোধ করে। দুর্গে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ফলে অবশিষ্ট হিন্দু সৈন্য দুর্গের বাইরে বেরিয়ে আসে এবং মরণপণ যুদ্ধ করে, কিন্তু পরাজিত হয়। মিনহাজ লিখছেন, ''The temples were converted into mosques....fifty

(57) H. M. Elliot and Ja Dowson, ibid, II, 215.
(58) H. M. Elliot and Ja Dowson, ibid, II, 230.

thousand men came under the collar of slavery and the plain became black as pitch with blood of Hindus.''[59] —অর্থাৎ, "সমস্ত মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হল, ৫০,০০০ হিন্দুকে (অর্থাৎ নারী ও শিশুকে) ক্রীতদাস হিসাবে পাওয়া গেল এবং (পুরুষ) হিন্দুর রক্তে মাটি পিচের মত কালো হয়ে গেল।" কাজেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এই সব রক্তপিপাসু ঘাতক নরদানবদের মধ্যে কতখানি শিল্পানুরাগ থাকা সম্ভব?

আগেই বলা হয়েছে যে, পরবর্তী সুলতান আলতামসও প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিল। মিনহাজ-উস-সিরাজের 'তাবাকৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থে আলতামসের বিস্তৃত ইতিহাস বিদ্যমান।[60] ছেলেবেলায় আলতামসকে দেখতে খুবই সুন্দর ছিল। সেই হিংসায় তার ভাইরা বাপ- মায়ের অজান্তে তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এক ঘোড়ার হাটে নিয়ে যায়। সেখানে এক ঘোড়া ব্যবসায়ীর কাছে তারা আলতামসকে বিক্রী করে দেয়। সেই ঘোড়া ব্যবসায়ী তাকে বুখারায় নিয়ে যায় এবং সেখানে হাজি বুখারি নামে এক ব্যক্তির কাছে তাকে বেচে দেয়। হাজি বুখারি আবার জামালুদ্দিন চস্ত নামক এক ব্যক্তির কাছে তাকে বেচে দেয়। ইতিমধ্যে আলতামস আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। কথিত আছে যে, তার পশ্চাদ্দেশ খুব মাংসল ও সুগঠিত ছিল এবং সেই কারণে সমকামী ব্যক্তিদের কাছে সে ছিল খুবই লোভনীয়।

যাই হোক, জামালুদ্দিন আলতামসকে গজনীতে নিয়ে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সংবাদ লম্পট মহম্মদ ঘোরীর কানে পৌঁছে যায়। মহম্মদ ঘোরী তখনই জামালুদ্দিনের কাছে ছোটে, কিন্তু জামালুদ্দিন তার দাম হাঁকে ১০০০ দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা। এত বেশী দাম হাঁকার ফলে মহম্মদ ঘোরীর খুব রাগ হয় এবং সে ঘোষণা করে দেয়, গজনীর কোন ব্যক্তি যেন আলতামসকে না কেনে।

এমন সময় গুজরাট ও নাহরওয়ালা জয় করে অনেক লুটের টাকা সঙ্গে নিয়ে কুতুবুদ্দিন গজনীতে আসে। গজনীতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এই লম্পটের কানেও আলতামসের খবর পৌঁছে যায়। আলতামসকে কেনার জন্য সে যথারীতি মহম্মদ ঘোরীর অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন মহম্মদ ঘোরী তাকে বলে যে, সে গজনীর বাজারে আলতামসকে কিনতে

---

(59) H. M. Elliot and Ja Dowson, ibid, II, 231.
(60) H. M. Elliot and Ja Dowson, ibid, II, 320.

পারবে না। তবে জামালুদ্দিন যদি তাকে দিল্লীর বাজারে নিয়ে যায় তবে সেখানে সে আলতামসকে কিনতে পারে। এদিকে আলতামসের প্রতি কুতুবুদ্দিনের আসক্তি এত প্রবল হয় যে, তার অনুরোধে জামালুদ্দিন তাকে দিল্লীতে নিয়ে আসে এবং যথা সময়ে কুতুবুদ্দিন তাকে ১০০০ দীনার দিয়ে কিনে নেয়।

ক্রমে কুতুবুদ্দিন আলতামসের প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে এবং মোহম্মদ ঘোরী যেভাবে তার বাধ্য হয়ে পড়েছিল সেও তেমনি আলতামসের বাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে আলতামস কুতুবুদ্দিনের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে কুতুবুদ্দিনকে সে দাবি মেনে নিতে হয়। কাজেই এই সব লম্পট ব্যক্তিরা তাদের শিল্পানুরাগের জন্য কুতুব মিনার তৈরি করেছে, এই মত কতখানি গ্রহণযোগ্য তা ভাববার বিষয়। আদৌ সম্ভব কিনা তা সুধীজনের বিচার্য।

যাই হোক, আজকের কুতুব মিনার যে প্রাক্-ইসলামী যুগে হিন্দুদের দ্বারা নির্মিত এবং এককালে যে এর নাম 'মেরু স্তম্ভ' ছিল, সে ব্যাপারে যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করাটা এখন যুক্তিযুক্ত হবে।

কুতুব মিনারের গায়ে বিক্রম-সম্বৎ ১৫০৪ (বা ১১৪৭ খ্রীঃ)-এ খোদিত একটি শিলালিপি আছে যা 'নাগরী' ভাষায় লেখা। ওই শিলালিপিটিকে কুতুব মিনারের অবিচ্ছেদ্য অংশ ধরে নিলে বলতে হয় যে, মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী অধিকার করার আগেও কুতুব মিনার ওখানে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকদের মত হল, পুরানো অনেক মন্দির বা ইমারৎ ভেঙে কুতুব মিনারের মাল-মশলা যোগাড় করা হয়েছিল এবং ঐ শিলালিপিটিও সেই সব মাল-মশলার সঙ্গে চলে এসেছে।[61]

কিন্তু এ যুক্তি কতখানি গ্রহণযোগ্য তা সুধীজনের বিচার্য, কারণ শিলালিপিটি যেভাবে কুতুব মিনারের গায়ে লাগানো আছে তাতে মনে হয় না যে, সেটা সকলের অলক্ষ্যে, উদ্দেশ্যহীনভাবে কাঁচামালের মত ব্যবহৃত হয়েছে। বরং এটাই মনে হয় যে সেটা খুব যত্নসহকারে উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই লাগানো হয়েছে। কাজেই তাকে কুতুবমিনারের অংশ হিসাবে গণ্য করাই সঙ্গত।

---

(61) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VI, 669

আচার্য বাপু বাণকর[62] জানাচ্ছেন যে, গত ১৯৭৪ সালে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর থেকে প্রকাশিত এবং পণ্ডিত কেদারনাথ প্রভাকর দ্বারা সম্পাদিত 'বরাহমিহির স্মৃতিগ্রন্থ' নামক গ্রন্থে কুতুব মিনারের প্রকৃত পরিচয় এবং আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিহিত আছে। উক্ত গ্রন্থের ১২৭ পৃষ্ঠায় উপরিউক্ত ১১৪৭ খ্রীস্টাব্দের শিলালিপিটির উল্লেখ আছে এবং বলা হচ্ছে যে, ঐ সময় স্তম্ভের মেরামত ও ব্যাপক সংস্কার করা হয়। যে সব হিন্দু রাজপুত কারিগর ঐ সংস্কারের কাজ করেছে তাদের নামও ঐ শিলালিপিতে আছে। এই তথ্য থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, আমাদের ঐতিহাসিকদের অনুমান ঠিক নয়। ঐ শিলালিপিটি কাঁচামাল হিসাবে অন্য কোন সৌধ থেকে আসেনি।

উক্ত গ্রন্থের ১৫৭ পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে যে সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের দ্বারা ঐ স্তম্ভ খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত হয়। সম্রাট বিক্রমাদিত্য দ্বারা নির্মিত যে লৌহস্তম্ভটি কুতুবমিনারের পাশে বসানো আছে, তার গায়ে সংস্কৃত ভাষায় ও ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা একটি লিপি আছে। ঐ লিপিতেও কুতুব মিনারের উল্লেখ আছে এবং কুতুব মিনারকে সেখানে 'প্রপাংশু বিষ্ণুধ্বজ' বলা হয়েছে।

উল্লিখিত গ্রন্থের ১৪৬-১৪৭ পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে যে, বিক্রমকীর্তি এই মেরুস্তম্ভ স্বয়ং বরাহমিহিরের তত্ত্বাবধানে রাজপুত কারিগরদের দ্বারা নির্মিত হয়। সেখানে আরও বলা হয় যে, বরাহমিহির 'মিহিরাবলী' নামে ইন্দ্রপ্রস্থে যে আশ্রম স্থাপন করেছিলেন, সেই সুবিশাল আশ্রম একদিকে ২৭ নক্ষত্রের মন্দির এবং অপরদিকে কালকাদেবীর মন্দির পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। স্তম্ভের প্রায় আধ মাইল দূরে পূর্বদিকে ২৭ নক্ষত্রের মন্দির অবস্থিত ছিল যা কুতুবুদ্দিন সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। স্তম্ভের পশ্চিমে ছোট্ট একটি টিলার উপর অবস্থিত কালকাদেবী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান। বর্তমানে তা 'সূরজকি ঠিকরি' নামে পরিচিত।

উক্ত গ্রন্থের ১৫২ পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে যে, সম্রাট বিক্রমাদিত্য অনুরূপ আরেকটি স্তম্ভ তৎকালীন গান্ধার দেশে (আফগানিস্তানে) নির্মাণ করেন। এই দ্বিতীয় বিক্রমকীর্তি স্তম্ভ-এর প্রকৃত নাম ছিল 'বেধমেরু।' রাজপুত কারিগরের অভাবে সম্রাট বিক্রমাদিত্য ঐ স্তম্ভ ইট ও সুরকি দিয়ে নির্মাণ

(62) Acharya Bapu Vankar, Itihas Darpan, New Delhi, III (1996), ii, 57.

করেন। বর্তমানে ঐ স্তম্ভ 'মিনার-এ-জাম' নামে পরিচিত। সেখানে আরও বলা হচ্ছে যে, মহম্মদ ঘোরীর বড় ভাই গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ বিন সাম ঘোরী ঐ মিনারের মেরামত করেন। তার গায়ে কোরানের বাণী উৎকীর্ণ করেন এবং নিজের নামের একখানা শিলালিপি সেখানে বসিয়ে দেন।

এই প্রসঙ্গে বলা উচিত হবে যে, কুতুব মিনারের গায়ে কুতুবুদ্দিন বা আলতামসের কোন শিলালিপি না থাকলেও উক্ত গিয়াসুদ্দিন ঘোরীর একখানা শিলালিপি কুতুব মিনারের গায়ে আছে। কাজেই অনুমান করা চলে যে, সংস্কারের নামে সাবেক মেরুস্তম্ভের সমস্ত হিন্দু চিহ্ন লোপাট করে, গায়ে কোরানের বাণী উৎকীর্ণ করে মেরুস্তম্ভকে পুরোপুরি ইসলামী কুতুব মিনারে রূপান্তরিত করার কাজটা উক্ত গিয়াসুদ্দিনই সম্পন্ন করেন এবং এই কাজের স্বাক্ষর হিসাবেই কুতুবের গায়ে ঐ শিলালিপিটি স্থাপন করেন।

উক্ত গ্রন্থের ঐ ১৫২ পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে যে, আলিগড় মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহম্মদ বলতেন যে, কুতুব মিনার মুসলমানদের কীর্তি নয়, এবং স্যার ক্যানিংহামও এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন।

উপরিউক্ত কুতুব-উল-ইসলাম মসজিদের গায়ে একটা পাথরের গায়ে লেখা আছে—'সূর্যমেরু পৃথ্বীঃ যন্ত্রৈঃ মিহিরাবলী যন্ত্রেণ'। লৌহস্তম্ভের গায়ে লেখা লিপিতে যে ব্রাহ্মী অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে, এই কথা কয়টিও সেই একই ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা। এ থেকে কয়েকটা বিষয় স্পষ্ট হয়। প্রথমতঃ, পুরাণো মন্দির ভেঙে ঐ মসজিদ তৈরি করা হয়েছে, যা মুসলীম ও আমাদের ঐতিহাসিকরা স্বীকার করে গিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সব সাবেক মিনার ও মন্দিরের সাথে জ্যোতির্বিদ্যার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল। তৃতীয়তঃ, ঐ সব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বরাহমিহির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং চতুর্থতঃ, সংস্কৃত 'মিহিরাবলী' থেকেই ক্রমে মিহিরওয়ালী ও বর্তমান মেহেরৌলী শব্দ এসেছে।

উল্লিখিত 'বরাহমিহির স্মৃতিগ্রন্থ' থেকে জানা যায় যে, এককালে উজ্জয়িনী (সম্রাট বিক্রমাদিত্যের রাজধানী) ও জয়পুরের মত মিহিরাবলীও জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা ও গবেষণার এক অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। আজ কুতুব মিনারের চারপাশে ভগ্নদশায় যে সব ঘরবাড়ী ছড়িয়ে রয়েছে

তা আচার্য বরাহমিহিরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'মিহিরাবলী আশ্রমের' ধ্বংসাবশেষ মাত্র। মুসলমান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার সেই সনাতন ধারা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়। মিহিরাবলীর আবাসিক আশ্রম পরিত্যক্ত হয় এবং বর্বর মুসলমান আক্রমণকারীরা সেই সব পরিত্যক্ত ঘরবাড়ির কোনটাকে মসজিদ, কোনটাকে মাদ্রাসা আবার কোনটাকে বা কবরখানায় রূপান্তরিত করে।

আগেই বলা হয়েছে যে কুতুব মিনারের উচ্চতা ২২৫ ফুট। অনেক পাঠকের কৌতূহল থাকতে পারে যে, এত উঁচু একটা স্তম্ভ জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার কোন্ কাজে ব্যবহৃত হত! তাই এ ব্যাপারে দু-একটি কথা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। মনে করা যাক যে, ধ্রুবতারা দিগন্তরেখার কত ডিগ্রী ওপরে আছে তা নির্ণয় করতে হবে। তাহলে পর্যবেক্ষককে স্তম্ভ থেকে এমন একটা দূরত্বে দাঁড়াতে হবে যাতে করে ধ্রুবতারা, স্তম্ভের শীর্ষদেশ এবং তার চোখ এক সরল রেখায় থাকে। এই অবস্থায় পর্যবেক্ষক ও স্তম্ভের মধ্যেকার দূরত্ব মেপে ত্রিকোণমিতির সূত্র দিয়ে ধ্রুবতারার উচ্চতা নির্ণয় করা যাবে। এই সব মাপজোকের সূত্র পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, স্তম্ভের উচ্চতা যত বাড়বে কৌণিক উচ্চতার মাপও ততই নির্ভুল হবে। এটা শুধু ধ্রুবতারাই নয়, আকাশের যে কোন জ্যোতিষ্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আমরা জানি যে ২২শে জুন, যেদিন দিন সব থেকে বড় হয়, সেদিন সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখার উপর চলে আসে। কর্কটক্রান্তি রেখার অক্ষাংশ ২৩১/২ ডিগ্রী এবং দিল্লী নগরীর অক্ষাংশ প্রায় ২৮১/২ ডিগ্রী। কাজেই ঐদিন দিল্লীতে সূর্য মাথার ঠিক উপরে না গিয়ে ৫ ডিগ্রী দক্ষিণে হেলে থাকবে। ফলে কুতুব মিনারের ছায়ার দৈর্ঘ্য (ঠিক দুপুর বেলায়) হবে ১৯.৭ ফুট। এরপর সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হবে এবং দক্ষিণ দিকে সরতে সরতে ২২শে ডিসেম্বর সে মকরক্রান্তি রেখার উপর চলে যাবে। তাই ঐ দিন ঠিক দুপুর বেলায় সূর্য ৫২ ডিগ্রী দক্ষিণে হেলে থাকবে এবং কুতুব মিনারের ছায়ার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ২৮৮ ফুট। কাজেই উত্তরায়ণ থেকে দক্ষিণায়ন বা দক্ষিণায়ন থেকে উত্তরায়ণ পর্যন্ত কুতুব মিনারের ছায়ার দৈর্ঘ্যের তফাত হবে প্রায় ২৬৮.৩ ফুট। ফলে ছায়ার দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস খুব নিখুঁতভাবে মাপা সম্ভব হবে এবং সূর্য তার গতিপথে কোন্ রাশিতে অবস্থান করছে তা নির্ভুল ভাবে হিসাব করা সম্ভব হবে।

শুধু তাই নয়, সূর্য কবে কোন্ রাশি থেকে নিষ্ক্রমণ করে পরবর্তী রাশিতে সংক্রমণ করবে সেটাও অত্যন্ত নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

সাবেক কালে কুতুব মিনারের জমিতে নানা রকম রেখা অঙ্কিত ছিল যা থেকে নির্ভুল ভাবে সময় নির্ণয়, এবং কোন্ রাশিতে সূর্য অবস্থান করছে তা ছায়া থেকে সঙ্গে সঙ্গে নিরূপণ করা সম্ভব হত। কালে সেই সব জ্যামিতিক রেখা ইত্যাদি বিনষ্ট হয়ে গেছে। উপরিউক্ত 'বরাহমিহির স্মৃতিগ্রন্থ' ছাড়াও পাটনা থেকে পণ্ডিত কমলা প্রসাদ মণি দ্বারা প্রকাশিত 'শ্রীমিহিরাচার্য বংশাবলী' নামক গ্রন্থেও কুতুব মিনার সংক্রান্ত আরও অনেক তথ্য নিহিত রয়েছে।[62]

কাজেই উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বর্তমান কুতুব মিনার সুলতান কুতুবুদ্দিন ও সুলতান আলতামস তৈরি করেছে, এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই ভ্রান্ত। ঐ স্তম্ভ তৈরি করেছিলেন সম্রাট বিক্রমাদিত্য। মুসলমানদের ভারতে আসার প্রায় ৮০০ বছর আগে, খ্রীস্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে জ্যোতির্বিদ্যাচার্য বরাহমিহির নিজ তত্ত্বাবধানে রাজপুত কারিগরদের দিয়ে ঐ স্তম্ভ তৈরি করান এবং তখন ঐ স্তম্ভের নাম ছিল 'মেরুস্তম্ভ'। 'মেরুস্তম্ভ'-এর আরবী ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ 'কুৎবমিনার'। কাজেই আজকের 'কুতুব মিনার' নামের মধ্য দিয়ে ঐ স্তম্ভের প্রকৃত নাম মেরুস্তম্ভের স্মৃতিকেই বহন করে চলেছে।

কিন্তু এসব কথা আজ বলার উপায় নেই। আমাদের ঐতিহাসিকরা চীৎকার করতে শুরু করবেন যে, ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে। তবে আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে যে ভবিষ্যতের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান একদিন প্রকৃত সত্য উদঘাটিত করবে। বাদবিতণ্ডার অবসান ঘটাবে।

---

(62) Acharya Bapu Vankar, Itihas Darpan, New Delhi, III (1996), ii, 57.

তাজমহল না তেজোমহালয়

এটা সকলেরই জানা আছে যে, বাদশা আকবর তাঁর সভাসদ আবুল ফজলকে দিয়ে তাঁর রাজত্বকালের ইতিহাস 'আকবরনামা' লিখিয়েছিলেন। ঠিক সেই রকম, বাদশা শাহজাহান তাঁর এক সভাসদ আবদুল হামিদ লাহোরীকে দিয়ে তাঁর রাজত্বকালের ইতিহাস 'বাদশানামা' লিখিয়েছিলেন। মূল 'বাদশানামা' ফার্সী ভাষায় আরবী হরফে লেখা এবং এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৪০৩ ও ৪০৪ পৃষ্ঠায় তাজমহলের প্রকৃত ইতিহাস আছে। যাই হোক, 'বাদশানামা'র প্রথম খণ্ডের ৪০৩ পৃষ্ঠার ২১ নং পঙ্‌ক্তি থেকে যা লেখা আছে তার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়—

২১। শুক্রবার, ১৫ই জমাদিয়াল আওয়াল, পরপারের যাত্রী পবিত্রা হজরৎ মমতাজ-উল-জামানির সেই পবিত্র মৃতদেহ,

২২। যা অস্থায়ীভাবে কবরস্থ করা হয়েছিল, তা

২৩। যুবরাজ শাহ সুজা বাহাদুর, ওয়াজির খাঁ এবং সতিউন্নেসা খানম, যারা

২৪। মৃতের মন-মেজাজের ব্যাপারে খুবই ওয়াকিবহাল ছিল,

২৫। এবং রানীদের রানীর মনোভাব বুঝতো, এবং তার কার্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিল,

২৬। তাদের সাহায্যে রাজধানী আকবরাবাদে (আগ্রা) আনা হল, এবং সম্রাট আদেশ দিলেন যে, প্রত্যহ গরীব-দুঃখী ও ফকিরদের মধ্যে জাকাত (ভিক্ষা) বিতরণ করা হোক।

২৭। শহরের দক্ষিণে, যেখানে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিশাল উদ্যান

২৮। যার মাঝখানে সেই বিশাল ইমারৎ, যা পূর্বে রাজা মানসিংহের সম্পত্তি ছিল এবং

২৯। যার বর্তমান মালিক তাঁর পৌত্র রাজা জয়সিংহ,

৩০। সেখানেই স্বর্গবাসী রানীকে কবরস্থ করা হবে স্থির করা হয়েছিল।

৩১। যদিও রাজা জয়সিংহ পূর্বপুরুষের সেই সম্পত্তিকে অতিশয় মূল্যবান মনে করতেন, তথাপি সম্রাট শাহজাহানকে তা বিনামূল্যে ছেড়ে দিতে রাজী হন।

৩২। কিন্তু, ধর্মীয় নিয়ম ও মৃতের প্রতি মর্যাদার কথা চিন্তা করে সতর্ক সম্রাট সেই প্রাসাদ বিনা পয়সায় নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না বিবেচনা করে শরীফাবাদ (নামক স্থান) তাঁকে দিলেন।

৩৩। কাজেই সেই বিশাল প্রাসাদ (আলি মঞ্জিল)-এর বদলে জয়সিংহকে সরকারী জমি দেওয়া হল।

৩৪। ১৫ই জমাদিয়াল আওয়াল শবদেহ আগ্রায় পৌঁছুবার পর

৩৫। তার পরের বছর সেই শোভন শবদেহকে চির বিশ্রামে শায়িত করা হল।

৩৬। আকাশচুম্বী মহিমান্বিত সেই সমাধি ক্ষেত্রে উপস্থিত রাজধানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সরকারী আদেশে

৩৭। সেই পুণ্যবতী রমণীর দেহকে সাধারণের দৃষ্টির আড়াল করল এবং

৩৮। সেই আকাশ-সমান গাম্ভীর্যপূর্ণ, শীর্ষদেশে গম্বুজ শোভিত (ওয়াগুম্বজে) মহিমান্বিত বিশাল প্রাসাদ (ইমারৎ-এ-আলিশান)

৩৯। এক মহিমামণ্ডিত স্মৃতিসৌধে পরিণত হল।

৪০। পরম শক্তিমান বাদশার ইচ্ছানুসারে অভিজ্ঞ ইমারৎবিদ্‌রা জ্যামিতির ভিত্তি স্থাপন করল এবং

৪১। সেই প্রাসাদ নির্মাণের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করা হল।

শাহজাহানের যেই বেগমের স্মৃতিতে তাজমহল তৈরি করা হয়েছে বলে আজ বলা হয়ে থাকে তার প্রকৃত নাম ছিল আরজুমন্দ বানু। ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর সঙ্গে শাহজাহানের বিয়ে হয় এবং বিবাহিত জীবনের ১৮ বছরে ১৪টি সন্তানের জন্ম দিয়ে তিনি মারা যান। প্রকৃতপক্ষে চতুর্দশ সন্তানের জন্ম দিতেই বর্তমান ভুসওয়ালের কাছে বুরহানপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। ঠিক কবে তাঁর মৃত্যু হয় এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। কারও মতে ১৬৩০ আবার কারও মতে ১৬৩১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। মৃত্যুর পর বুরহানপুরের একটি উদ্যানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, এই ঘটনার মাস ছয়েক পরে মৃতদেহ কবর থেকে তুলে আগ্রায় আনা হয় এবং 'বাদশানামা' অনুসারে তার পরের বছরই সেই মৃতদেহকে পাকাপাকি ভাবে কবরস্থ করা হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাজমহলের মত বিশাল সৌধ নির্মাণ করা সম্ভব নয়। কাজেই সাধারণ বুদ্ধি বলে যে, সাবেক কোন সৌধকেই সমাধি সৌধতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। এইজন্য সেই সাবেক সৌধের কিছুটা পরিবর্তন করা হয়। এইসব কাজ সারতে বছরখানেক সময় লাগে এবং ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। ততদিন মৃতদেহকে অবশ্যই আগ্রার কোন স্থানে অস্থায়ী কোন কবরে রাখা হয়েছিল। যে সাবেক সৌধকে সমাধি সৌধে পরিণত করা হয়েছিল তা জয়পুরের রাজপুত রাজা মানসিংহের সম্পত্তি ছিল।

কাজেই বাদশানামার তথ্য অনুসারে যে বিষয়গুলো পরিষ্কার হচ্ছে তা হল—

১। শীর্ষদেশে গম্বুজ শোভিত রাজা মান সিংহের যে প্রাসাদ আগ্রায় ছিল, শাহজাহানের আমলে রাজা জয়সিংহ তার মালিক ছিলেন।

২। বাদশা শাহজাহান সেই সুবিশাল প্রাসাদ (ইমারৎ-এ-আলিশান)-কে বেগম আরজুমন্দ বানুর সমাধি সৌধে রূপান্তরিত করতে মনস্থ করেন।

৩। সেই প্রাসাদ রাজা জয়সিংহ শাহজাহানকে বিনা পয়সায় দিতে রাজী হন।

৪। কিন্তু ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও মৃতের সম্মানহানির আশঙ্কা করে শাহজাহান তা নিখরচায় নেওয়াটা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি।

৫। শাহজাহান রাজা জয়সিংহকে শরীফাবাদ নামে কোন এক স্থানে কিছু সরকারী জমি দান করলেন এবং তার বদলে ওই প্রাসাদ অধিগ্রহণ করলেন।

৬। এই সব ব্যবস্থা পাকা করে জমাদিয়াল আওয়াল মাসের ১৫ তারিখে বেগমের মৃতদেহ বুরহানপুর থেকে আগ্রায় আনা হল।

৭। মৃতদেহ আনার সময় সঙ্গে ছিল যুবরাজ শাহসুজা, ওয়াজির খাঁ এবং সতিউন্নেসা খানম।

৮। ইতিমধ্যে ইমারতী কারিগরেরা রাজা জয়সিংহের সাবেক প্রাসাদকে কবরখানায় রূপান্তরিত করার কাজকর্ম শুরু করে দেয় এবং তার জন্য মাপজোক করতে শুরু করে।

৯। এই সব কাজ সারতে বছরখানেক সময় লাগল এবং ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হল।

১০। মৃতদেহকে আগ্রায় আনার পরের বছরই রাজা জয়সিংহের প্রাসাদে তাকে পাকাপাকিভাবে কবরস্থ করা হয়।

অন্য সব কথা বাদ দিলেও, তাজমহল নামে খ্যাত আজকের সমাধি সৌধ যে শাহজাহান তৈরি করেননি তা বাদশানামায় উল্লিখিত তথ্যাদি থেকে সুস্পষ্ট। রাজপুত হিন্দুরাজা জয়সিংহ তথা মানসিংহের সাবেক প্রাসাদকেই যে তাজমহলে রূপান্তরিত করা হয়েছে তা প্রমাণ করতে বাদশানামার তথ্যাদিই যথেষ্ট। তবুও 'অধিকন্তু ন দোষায়' হিসাবে আরও অনেক তথ্য প্রমাণ হাজির করা যেতে পারে। তবে তার আগে বাদশানামায় বর্ণিত আর একটি তথ্য সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে।

বাদশানামায় বলা হয়েছে যে, জয়সিংহকে শরীফাবাদ নামক স্থানে সরকারী জমি দান করা হয়েছিল এবং তার বদলে প্রাসাদ অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই শরীফাবাদ কোথায়? তার কোন উল্লেখ বাদশানামায় নেই। উপরন্তু সেই শরীফাবাদের কোন জমি এবং কতটা জমি রাজা জয়সিংহকে দেওয়া হয়েছিল তারও কোন উল্লেখ বাদশানামায় নেই। এমন হতে পারে যে, পার্বত্য বা মরু অঞ্চলের কোন ব্যবহারের অযোগ্য জমিই রাজা জয়সিংহকে দেওয়া হয়েছিল। স্মরণ করা যেতে পারে যে, 'ভূ-দান' আন্দোলনের সময় অনেকে বিনোবাভাবেকে এই রকম অনেক পরিত্যক্ত ও ব্যবহারের অযোগ্য জমি দান করেছিলেন।

যে সম্ভাবনা সব থেকে বেশী তা হল, কোন রকম ক্ষতিপূরণ না দিয়েই শাহজাহান গায়ের জোরে রাজা জয়সিংহের প্রাসাদ অধিগ্রহণ করেন। এতদিন ইসলামের এই পুণ্য কার্য সমাধা হয়নি, কারণ এক-কালে, রাজা মানসিংহের আমলে জয়পুরের রাজপুতরা মোগলদের বশ্য ছিল। কিন্তু শাহজাহানের বেতনভোগী ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরীর পক্ষে সম্রাটের এই বর্বরোচিত কাজ বর্ণনা করা সম্ভব হয়নি। তাই তিনি এক কল্পিত জমিদানের গল্প তৈরি করে সম্রাটের সম্মান বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন মাত্র।

23 بود مصحوب بادشاهزادهٔ نامدار محمد شاه شجاع بهادر و وزیر خان

24 و ستی النساء خانم که بمزاج شناسی و کاردانی بمرتبهٔ اولی پیش

25 بستی و وکالت آن سالکهٔ جهان عفت بجهانیان رسیده بود روانهٔ

26 دار الخلافه اکبر آباد نمودند. و حکم شد که همه روزه در راه آن بسیار

27 دراهم و دنانیر بی شمار بفقرا و نیازمندان دهند. و زمینی در

28 نهایت رفعت و نزاهت که جنوب رویهٔ آن مصر جامع است. و

29 پیش ازین منزل راجه مانسنگه بود. و درینوقت براجه جیسنگه

30 نبیرهٔ او تعلق داشت. برای مدفن آن بهشت مواطن برگزیدند.

31 اگرچه راجه جیسنگه حصول این دولت را فوز عظیم دانست. اما

32 از روی احتیاط که در جمیع شیون خصوصاً امور دینیه ناگزیر است

33 در عوض آن عالی منزلی از خالصهٔ شریفه بار مرحمت فرمودند

34 بعد از رسیدن نعش بآن شهر گرامی پانزدهم جمادی الاولی

35 سال آینده پیکر نورانی آن آسمانی جوهر بخاک پاک سپرده آمد

36 و متصدیان دار الخلافه بحکم معلی عجالة الوقت تربت آنکه سر نهفت

37 آن جهان عفت را از نظر پوشیدند. و عمارتی عالیشان و گنبدی

38 رفیع بنیانی که تا رستخیز در بلندی یادگار همت گردون رفعت

39 حضرت صاحبقرانی ثانی باشد. و در استواری نمودار استقامت

40 عزایم بانی. طرح انداختند. و مهندسان دور بین و معماران صنعت

41 آفرین چهل لک روپیه اخراجات این عمارت برآورد نمودند.

মোল্লা আবদুল হামিদ লাহোরী রচিত 'বাদশা নামা'র প্রথম খন্ডের ৪০৩ ও ৪০৪ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি, যাতে তাজমহলের প্রকৃত ইতিহাস রয়েছে।

বাদশানামায় খুব পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে যে, তাজমহলের ব্যাপারে শাহজাহান মোট ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। একটা প্রাসাদের মেরামতি, সংস্কার বা হিন্দু প্রাসাদকে ইসলামী রূপ দেবার জন্য যা য়া করণীয় তা করতে ৪০ লক্ষ টাকা যথেষ্টই বটে। কিন্তু মাত্র ৪০ লক্ষ টাকায় তাজমহলের মত একটি মর্মর সৌধ নির্মাণ করা যে তখনকার দিনেও সম্ভব ছিল না, তা পরবর্তী ঐতিহাসিকদের নজরে আসে। তাই তাঁরা খরচের অঙ্ক ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাড়াতে শুরু করেন। কিন্তু কোন্ সূত্র থেকে তাঁরা এসব তথ্য যোগাড় করেছেন তার কোন নির্দেশ তাঁরা দেন নি। তাছাড়া এই সব কল্পিত ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যে এত অসঙ্গতি রয়েছে যে বলতে গেলে তা নিতান্তই হাস্যকর।

আগেই বলা হয়েছে, আবদুল হামিদ লাহোরী বলে গেছে মোট খরচের পরিমাণ ৪০ লক্ষ টাকা। কিন্তু আজকের ঐতিহাসিকরা একে কোটির ঘরে নিয়ে গিয়েছেন। নিচের সারণীতে খরচের টাকা ও তার সূত্র দেওয়া হল।

সারণী—১

	খরচ (টাকা)	সূত্র
১	৪০,০০,০০০	আবদুল হামিদ লাহোরী(63)
২	৫০,০০,০০০	শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার(64)
৩	৫০,০০,০০০	শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়(65)
৪	১,৫০,০০,০০০	মহম্মদ দীন(66)
৫	১,৮৪,৬৫,০০০	গাইড টু তাজ(67)
৬	৪,১৮,৪৮,৮২৬	কানোয়ারলাল(68)
৭	৯,১৭,০০,০০০	কীনস্(69)
৮	৩,০০,০০,০০০	তাবার্ণিয়ে(70)

সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রীঅতুলচন্দ্র রায় এবং শ্রীরমেশচন্দ্র

---

(63) Mullah Abdul Hamid Lahori, Badsahnama, Bibhiotheca Indica Services, Asiatic Society of Bengal, I, 404. (64) R. C. Majumdar, ibid, Macmillan, 586. (65) Atul Chandra Roy, ibid, I, 186. (66) Mohammad Din, Illustrated Weekly, (1951), Dec. 30. (67) Guide To Taj At Agra, Victoria Press, 14. (68) Kanwar Lal, The Taj, R. K. Publishing House, Delhi, 10. (69) Keene's Handbook For Visitors to Agra and Its Neighbourhood, E. A. Duncan (Editor), Thacker's Handbook of Hindustan, 154. (70) Atul Chandra Roy, ibid, I, 107.

মজুমদার মোটামুটিভাবে আবদুল হামিদ লাহোরীর তথ্যকেই মেনে নিয়েছেন। গাইড টু তাজ মতে যে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা খরচ দেখানো হয়েছে তার মধ্যে রাজকোষ থেকে দেওয়া হয়েছিল ৮৬,০৯,০০০ টাকা এবং বাকীটা বিভিন্ন রাজা ও নবাবরা দিয়েছিলেন। আরও দেখা যাচ্ছে যে, কীন সাহেবের দেওয়া খরচের অঙ্ক সব থেকে বেশী এবং আবদুল হামিদ লোহারীর মান থেকে তা প্রায় ২৩ গুণ বেশী।

কবে তাজ নির্মাণ শুরু হয়েছিল এবং কবে তা শেষ হয়েছিল এ ব্যাপারেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে ঘোরতর অনৈক্য রয়েছে। নিচের সারণীতে কিছু তথ্য ও তার সূত্র দেওয়া গেল।

সারণী—২

	নির্মাণ শুরু (খ্রীঃ)	নির্মাণ শেষ (খ্রীঃ)	ব্যয়িত সময়	সূত্র
১	১৬৩২	১৬৫৪	২২ বছর	এনসাঃ ব্রিটাঃ[71]
২	১৬৩২	১৬৫০	১৮ বছর	মহম্মদ দীন[66]
৩	১৬৩১	১৬৪৮	১৭ বছর	আর. সি. অরোরা[72]
৪	১৬৪১	১৬৬৩	২২ বছর	তাভার্নিয়ে[73]
৫	১৬৩০	১৬৪৮	১৮ বছর	কলঃ গেজেট[74]

আগেই বলা হয়েছে যে, বেগম আরজুমন্দ বানুর মৃত্যু হয়েছে ১৬৩০ অথবা ১৬৩১ সালে। বেগমের মৃত্যুর আগেই তার সমাধি নির্মাণ শুরু হতে পারে না। তাই বেগমের মৃত্যুর বছরখানেক পরে ১৬৩২ সালে তাজ নির্মাণ শুরু হয়েছিল ধরে নেওয়াই সঙ্গত। ঐতিহাসিক ডঃ অতুলচন্দ্র রায়, কবে তাজ নির্মাণ শুরু হয়েছিল এবং কবে তা শেষ হয়েছিল সে সব বিতর্কে না গিয়ে শুধু মন্তব্য করেছেন যে তাজ নির্মাণ করতে মোট ১৮ বছর সময় লেগেছিল।[70] সব থেকে লক্ষ্য করার বিষয় হল, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এ ব্যাপারে আশ্চর্যজনকভাবে

(71) Encyclopaedia Britannica, (1964), XXI, 758. (72) R. C. Arora, The City of Jaj, Hibernian Press, Calcutta. (73) Jean Baptiste Tavernier, Travels in India, (Tr. V. Ball), (1889), MacMillan & Co., London. (74) Columbia Lippincot Gazetteer, II, 19.

নীরব। সত্যনিষ্ঠ তথ্যের অভাবই যে তাঁর এই নীরবতার কারণ তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। তাভার্নিয়ের মত মেনে নিলে বলতে হয় যে, বেগমের মৃত্যুর প্রায় ১০ বছর পরে তাজ নির্মাণ শুরু হয় এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তা শেষ হয়, যা একেবারেই অসম্ভব।

এই সব আলোচনা থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে, কবে তাজ নির্মাণ শুরু হয়েছিল এবং কবে তা শেষ হয়েছিল, এ ব্যাপারে কোন প্রামাণ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য তথ্য ঐতিহাসিকদের কাছে নেই। এটাই স্বাভাবিক, কারণ শাহজাহান আদৌ তাজ নির্মাণ করেননি। কাজেই ঐতিহাসিকরা তথ্য পাবেন কোথা থেকে? প্রকৃত তথ্য পেতে গেলে তাঁদের আরও প্রায় ৫০০ বছর পিছিয়ে যেতে হবে। কারণ তাজ নির্মাণ করেছিলেন চান্দেলরাজ পরমার্দিদেব, যিনি খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি।

ঐতিহাসিকদের মতে তাজের নক্‌শা করার জন্য আন্তর্জাতিক টেণ্ডার ডাকা হয়েছিল এবং সেই নক্‌শার সঙ্গে কাঠের তৈরি তাজের একটি ছোট্ট নমুনাও দাখিল করতে বলা হয়েছিল। বহু নক্‌শা ও নমুনা জমা পড়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত নামকরা স্থপতিদের ডেকে একটা পরিষদ গঠন করা হয়। সেই পরিষদ তাজের চূড়ান্ত নমুনা নির্বাচন করে। এ ব্যাপারে এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা বলছে, ''The plan was prepared by a council of architects from India, Persia, Central Asia and beyond and the credit for the final plan was given to Ustad Isa of either Persian or Turkish origin''.[75] —অর্থাৎ, "ভারত, পারস্য, মধ্য এশিয়া ও আরও দূর দূর দেশের স্থপতিদের নিয়ে একটা পরিষদ গঠিত হয় এবং এই পরিষদই তাজের নক্‌শা তৈরি করে। চূড়ান্ত নক্‌শার কৃতিত্ব দেওয়া হয় পারস্য কিংবা তুরস্কের স্থপতি, উস্তাদ ইশা নামক এক ব্যক্তিকে।" অর্থাৎ ভারত, পারস্য, ও মধ্য এশিয়ার বিশিষ্ট স্থপতিদের কাছ থেকে নক্‌শা গ্রহণ করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত পারস্যের অথবা তুরস্কের স্থপতি উস্তাদ ইসার নক্‌শা চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে।

এই সব হাস্যকর বিবরণ পাঠ করলে এটাই ভেবে বিস্মিত হতে

---

(75) Encyclopaedia Britannica, (1964), XXI, 759.

হয় যে মানুষের লাগামছাড়া কল্পনা কতদূর যেতে পারে। অথবা গল্পের গরুকে কতটা গাছে তোলা যেতে পারে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এই সব ঘটনা ঘটেছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে, যখন ডাঙায় ঘোড়া আর জলে দাঁড়টানা নৌকাই ছিল দ্রুতগতির যান। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের উপায় ছিল গরুর গাড়ী, যা দিনে সর্বাধিক ৪০ মাইল যেতে পারত (তাভার্নিয়ে)।

একটা উদাহরণ দিলে তখনকার দিনের যাতায়াতের ব্যাপারটা আর একটু স্পষ্ট হবে। শাহজাহানের প্রায় ১০০ বছর পরে, ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলা কোলকাতা আক্রমণ করেন। ইংরাজরা হেরে গিয়ে ফলতায় পালিয়ে যায়। তখন ক্লাইভ সাহেব কোলকাতায় ছিলেন না। ড্রেক সাহেব জাহাজে করে মাদ্রাজ রওনা দেন ক্লাইভকে সে খবর পৌঁছে দিতে। মাদ্রাজ যেতে ড্রেক সাহেবের একমাস সময় লাগে এবং সেখান থেকে লোক-লস্কর ও ক্লাইভ সাহেবকে সঙ্গে করে কোলকাতায় ফিরতে লাগে আরও এক মাস।

কাজেই সেই যুগে বেগম আরজুমন্দ বানু মারা যাবার এক বছরের মধ্যে সারা দুনিয়ার টেণ্ডার ডেকে তা পরীক্ষা করে, নক্‌শা নির্বাচন করে এবং দরদাম ঠিক করে তাজ তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেল, এই গল্প ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করতে পারেন, তবে মনে হয় কোন সাধারণ স্বল্পবুদ্ধি মানুষও তা বিশ্বাস করতে সম্মত হবে না।

আগেই বলা হয়েছে যে, এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার মতে, অনেক বাস্তুকারের নক্‌শা থেকে শেষ পর্যন্ত উস্তাদ ইশা নামক এক ব্যক্তির নক্‌শাই গৃহীত হয়। অনেকের মতে সেই ব্যক্তির নাম মাকামাল খাঁ বা কারও মতে আব্দুল করিম। কারও মতে আবার সেই ব্যক্তি ইটালীর ভেনিস শহরের লোক ছিল এবং নাম ছিল জারেনিমো ভেরোনা। এ ব্যাপারে যেটা লক্ষ্য করা যায় তা হল, মুসলমানদের চেষ্টা সে শিল্পীকে ইরান, ইরাক বা তুরস্কের লোক বলে প্রমাণ করা আর কিছু ইয়োরোপীয়ের চেষ্টা তাকে পাশ্চাত্যের লোক বলে প্রমাণ করা। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ১৬৫০ সালে Thevenot নামে এক ফরাসী পর্যটক তাজমহল দেখে বর্ণনা করে গেছেন তাজ ভারতীয়দের সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।[76]

---

(76) Atul Chandra Roy, ibid, I, 185.

তাজ তৈরি করতে কত শ্রমিক লেগেছিল সে ব্যাপারেও মতভেদ আছে। তবে বেশীরভাগ ঐতিহাসিকের মত হল, ২০,০০০ শ্রমিক কাজ করেছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই সব ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতের এত অমিল কেন? এর কারণ হল, শাহজাহানের সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক বা লিপিকারদের লেখার মধ্যে তাজ সম্পর্কে তেমন কোন তথ্যপূর্ণ বিবরণ নেই। সমসাময়িক যে সব গ্রন্থে শাহজাহানের রাজত্বকালের ইতিহাস পাওয়া যায় সেগুলো হল—

১। আবদুল হামিদ লাহোরী রচিত 'বাদশানামা',
২। সম্রাট জাহাঙ্গীরের লেখা আত্মজীবনী 'ওয়াকিঅৎ জাহাঙ্গিরী',
৩। ইনায়েৎ খাঁ রচিত 'সাহ্জাহাননামা',
৪। মুফাজ্জল খাঁ রচিত 'তারিখ-ই-মুফাজ্জলি',
৫। বখতিয়ার খাঁ রচিত 'মিরাৎ-ই-আলম',
৬। মহম্মদ কাজিম রচিত 'আলমগির নামা' এবং
৭। কাফি খাঁ রচিত 'মুন্তাখাবুল লুবাব'।

কিন্তু আফসোসের কথা হল এই যে, একমাত্র 'বাদশানামা' ছাড়া আর কোন গ্রন্থেই তাজমহলের কোন বিবরণ নেই। আর কেন নেই, সে প্রশ্নের একটাই জবাব, শাহজাহান তাজমহল আদৌ তৈরি করেননি, কাজেই তার বিবরণ কেমন করে থাকবে?

কাজেই বাদশানামার বিবরণকেই প্রকৃত সত্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না, আর তা হল মানসিংহের বংশধর রাজা জয়সিংহের মর্মর সৌধকে গায়ের জোরে দখল করে শাহজাহান তাকে এক কবরখানায় রূপান্তরিত করেছেন। আর সেই রূপান্তরিত কবরখানাকেই আজ আমরা তাজমহল বলছি।

আগ্রা শহরের একটি জায়গার নাম বটেশ্বর এবং তাজমহল থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৪ কিলোমিটার। বিগত ১৯০০ সালে ঐ বটেশ্বরের একটা ঢিবি খুঁড়ে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের প্রথম অধিকর্তা জেনারেল কানিংহাম একটা শিলালিপি আবিষ্কার করেন, যা 'বটেশ্বর শিলালিপি' নামে খ্যাত। পরে জেনারেল কানিংহাম শিলালিপিটি ভারত সরকারের হাতে তুলে দেন এবং বর্তমানে তা লখ্নৌ শহরের সরকারী সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

সংস্কৃত ভাষায় লেখা ঐ বটেশ্বর শিলালিপিতে মোট ৩৪টি শ্লোক

আছে যার মধ্যে ২৫, ২৬ এবং ৩৪ নম্বর শ্লোক তিনটি বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। এই শ্লোক তিনটি হল—

প্রাসাদো বৈষ্ণবস্তেন নির্মিতোতবহন্ হরি মূর্দ্ধাস্প্রিশতি যো নিত্যং পদমসৈব মধ্যমম্।।২৫।।

অকার‍্যচ্চ স্ফটিকাবদাতমসাবিদং মন্দিরমিন্দুমৌলেঃ
ন জাতুযস্মিন্নিবসন্সদেবঃ কৈলাসবাসায়চকার চেতঃ।।২৬।।

পক্ষ ত্র্যক্ষমুখাদিত্য সংখ্যে বিক্রমবৎসরে আশ্বিন শুক্ল পঞ্চম্যাং বাসরে বাসবে শিতু।।৩৪।।

উক্ত শ্লোক তিনটির বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়—

তিনি একটি সৌধ নির্মাণ করেছেন, যার মধ্যে ভগবান বিষ্ণু অধিষ্ঠান করছেন, রাজা মাথা নত করে যার চরণ স্পর্শ করেন।।২৫

রাজা মর্মর পাথরে আরও একটি মন্দির নির্মাণ করেছেন এবং সেখানে সেই দেব অধিষ্ঠান করছেন যাঁর কপালে শোভা পাচ্ছে চন্দ্র। যিনি এই সুরম্য মন্দিরকে বাসস্থান হিসাবে পেয়ে কৈলাসে ফিরে যাবার বাসনা ত্যাগ করেছেন।।২৬

(এই শিলালিপিটি) আজ বিক্রম সম্বতের ১২১২ সালের আশ্বিন মাসে, রবিবার, শুক্লা পঞ্চমীর দিনে স্থাপন করা হল।। ৩৪

শ্রী ডিজে কালে মহাশয় তাঁর 'এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে এই শিলালিপিটির উল্লেখ করেছেন।[77] ঐ গ্রন্থের ১২৪ পৃষ্ঠায় শ্রীকালে লিখছেন, "আগ্রার নিকটে মুঞ্জ বটেশ্বরে পাওয়া এই শিলালিপিটি বর্তমানে লখ্নৌ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। বিক্রম সম্বৎ ১২১২ সালের (১১৫৬ খ্রীঃ) আশ্বিন মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে ঐ শিলালিপিটি চন্দ্রত্রেয় বংশের রাজা পরমার্দিদেব কর্তৃক স্থাপিত।....ভগবান বিষ্ণু এবং ভগবান মহাদেবের জন্য তিনি যে দুটি শ্বেতপাথরের মর্মর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, পরবর্তী কালে মুসলমান আক্রমণকারীরা তা অপবিত্র করে। সম্ভবতঃ কোন দূরদর্শী ব্যক্তি ঐ দুই মন্দির সংক্রান্ত উল্লিখিত শিলালিপিটি বটেশ্বরে নিয়ে গিয়ে মাটির তলায় পুঁতে দেয়। এতকাল তা মাটির তলাতেই ছিল। গত ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম তা উদ্ধার করেন।"

(77) D. J. Kale, Epigraphica India, (Pub. by S. D. Kale & M. D. Kale), I, 270-274.

উল্লিখিত গ্রন্থের ১৪০-১৪১ পৃষ্ঠায় শ্রীকালে মহাশয় চন্দ্রত্রেয় বা চান্দেল বংশের রাজাদের যে বংশ তালিকা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে পরমার্দিদেব ১১৬৫ বা ১১৬৭ খ্রীস্টাব্দে রাজা হন। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে চান্দেল রাজ পরমার্দিদেব ১১৬৩ থেকে ১২০৩ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।[78]

এই চান্দেল রাজ পরমার্দিদেবের অন্য নাম ছিল পরমাল। ইতিহাসে চান্দেলদের রাজ্য বুন্দেলখণ্ড নামে পরিচিত। যার আসল নাম 'জেজাকভুক্তি'। উত্তরে কাল্পি ও অম্বি এবং পূর্বে যমুনা নদী পর্যন্ত এঁদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এঁদের অধিকারে অনেক সুরক্ষিত দুর্গ ছিল যার মধ্যে মহোবা, খাজুরাহো এবং কালিঞ্জর দুর্গ প্রধান।[78]

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের ঐতিহাসিকরা এতকাল এই ভ্রান্ত মত প্রচার করে এসেছেন যে, শাহজাহান খুবই শৌখিন ব্যক্তি ছিলেন এবং সেই কারণে তাঁর আমলেই মার্বেল পাথরের দ্বারা সৌধ অট্টালিকা ইত্যাদির নির্মাণ শুরু হয়। এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রী এস. কে. সরস্বতী লিখছেন, ''Imbued with the prevailing ideas and his (Sahjahan's) love for pomp and luxury and display of splendour, Shahjahan chose marble as the chief medium for all his architectural undertakings.''[79] —অর্থাৎ, "বিলাসিতা, জাঁকজমক ও জৌলুস প্রদর্শনের প্রতি অনুরক্ত এবং নিত্য নতুন কল্পনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সম্রাট শাহজাহান শ্বেত পাথরকেই তার স্থাপত্য কীর্তির মাধ্যম হিসাবে বেছে নেন।" কিন্তু বটেশ্বর শিলালিপি এই ভ্রান্ত ধারণার মূলোচ্ছেদ করে দিয়েছে। সব থেকে মজার ব্যাপার হল, যে সমস্ত শ্বেত পাথরের সৌধকে লক্ষ্য করে আমাদের ঐতিহাসিকরা এতদিন ধরে শাহজাহানের স্তুতি করে এসেছেন, তার একটাও শাহজাহান তৈরি করেননি।

যাই হোক, এখন প্রশ্ন হল বটেশ্বর শিলালিপিতে বর্ণিত মর্মর পাথরে নির্মিত আগ্রার দুই মন্দির গেল কোথায়? আজকের আগ্রায় শ্বেতপাথরের তৈরি দুটিমাত্র সৌধ আছে, তাজমহল ও ইদমৎ-উদ্-দৌলার (নূর জাহানের বাবা) সমাধি। কাজেই অনুমান করা চলে যে, বটেশ্বর

---

(78) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, V, 122.
(79) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 781.

শিলালিপিতে বর্ণিত দুই শ্বেতপাথরের মন্দিরের একটিকে তাজমহল ও অন্যটিকে ইদমৎ-উদ্-দৌলার কবরখানা বানানো হয়েছে। সাক্ষ্যপ্রমাণ যা পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, শিবমন্দিরটিকে তাজমহল করা হয়েছে। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বিষ্ণু মন্দিরটিকেই ইদমৎ-উদ্-দৌলার সমাধিক্ষেত্র করা হয়েছে।

কাজেই প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, আজকের তাজমহল যে এককালে শিবমন্দির ছিল তার প্রমাণ কি? তাই কিছু প্রমাণ এক এক করে নিচে দেওয়া গেল।

১। তাজমহলের প্রধান গম্বুজের শীর্ষদেশের ধাতব চূড়ায় বা pinnacle-এ রয়েছে ত্রিশূল, যা অভ্রান্তভাবে ভগবান মহাদেবের অস্ত্র ও প্রতীক।

২। বটেশ্বর শিলালিপিতে এই মন্দিরকে অতীব শোভন বলা হয়েছে। তা এতই সুন্দর যে সেই মন্দিরকে বাসস্থান হিসাবে পেয়ে ভগবান মহাদেব তাঁর আবাস কৈলাসে ফিরে যাবার বাসনা পরিত্যাগ করেছেন। একমাত্র তাজমহলের সৌন্দর্যই বটেশ্বর শিলালিপিতে বর্ণিত মন্দিরের সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলে।

৩। তাজ-পরিসরের মধ্যে যে বাগান আছে তার সমস্ত গাছ-গাছড়া হিন্দুর কাছে পবিত্র। সেই বাগানে বেল ও হরশৃঙ্গার গাছের অস্তিত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয় কারণ বেলপাতা ও হরশৃঙ্গার ফুল ছাড়া শিবের পূজা হয় না।

৪। তাজমহলে দুই তলায় কবর রয়েছে—উপরের তলায় নকল কবর এবং নিচের তলায় আসল কবর। দুই তলায় কবর সমন্বিত আর কোন মুসলীম কবরখানা নেই। কিন্তু দুই তলায় শিবলিঙ্গ বিশিষ্ট শিবমন্দির উজ্জয়িনী ও ভারতের অন্যান্য জায়গায় বিদ্যমান।

৫। মুসলীম কবরখানায় কেউ কবরকে প্রদক্ষিণ করে না। কিন্তু তাজমহলে কবর প্রদক্ষিণ করার ব্যবস্থা আছে। তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এককালে ভক্তরা সেই পথে শিবলিঙ্গকে প্রদক্ষিণ করত।

৬। তাজমহলের প্রধান গম্বুজের ছাদ থেকে ঝুলছে একটা শিকল, যার সঙ্গে কবরখানার কোনই সম্পর্ক নেই। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব

বিভাগের লোকেরা সেই শিকলের সঙ্গে একটা বৈদ্যুতিক বাল্ব ঝুলিয়ে দিয়েছে। এককালে ঐ শিকলের সঙ্গে ঝোলানো ছিল একটি মঙ্গল ঘট, যার থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল শিবলিঙ্গের মাথায় পড়ত। আজও তাজ দেখাবার সময় গাইডরা পর্যটকদের বলে যে, বৃষ্টি হলে সেই বৃষ্টির জল ফোঁটা ফোঁটা করে কবরের উপরে পড়ে। এটা আর কিছুই নয়, সাবেককালের শিবলিঙ্গের ওপর জল পড়ার স্মৃতিই প্রবাদে পরিণত হয়েছে মাত্র।

৭। তাজমহলের প্রধান গম্বুজের নিচে আওয়াজ করলে তা অনেকক্ষণ ধরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, যা একটা কবরখানার পক্ষে খুবই বেমানান। কারণ কবরখানায় নীরবতা ও নিস্তব্ধতা পালন করাই রীতি। কিন্তু শিব মন্দির বা যে কোন হিন্দু মন্দিরের পক্ষে এই প্রতিধ্বনি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দেবতার উদ্দেশে সংস্কৃত স্তবস্তুতি করলে তা প্রতিধ্বনিত করার জন্যই এই ব্যবস্থা। আজ পর্যটকরা নানা রকম শব্দ করে এই প্রতিধ্বনি পরীক্ষা করেন। কিন্তু যদি তাঁরা ওঁ কিংবা 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' বলেন, তবে খুব সহজেই প্রতিধ্বনির পার্থক্য বুঝতে পারবেন।

৮। তাভার্ণিয়ে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে লিখে গেছেন যে, সেই সময় তাজপরিসরের মধ্যে বাজার বসত। একমাত্র হিন্দুর মন্দিরেই বাজার বসে, যেখানে ফুল, ফল, প্রসাদ ও আরও নানান রকম জিনিস বেচা-কেনা হয়। কালীঘাট, পুরী, দক্ষিণেশ্বর, মাদুরাই ইত্যাদি মন্দিরের বাজার তারই নমুনা। ভক্তরা এই বাজার থেকে তীর্থ করার স্মারক হিসাবে নানা জিনিস কিনে নিয়ে যায়। কোন মুসলীম কবরখানায় কোন দিনও বাজার বসে না।

৯। তাজমহলের ডান দিকে, লাল পাথরের মেঝেতে, শীর্ষদেশের ধাতব চূড়াটির একটি প্রতিকৃতি আঁকা আছে। তাতে ত্রিশূল ছাড়াও মঙ্গলঘট, আম্রপল্লব ইত্যাদি হিন্দুচিহ্ন রয়েছে, যা কোন মুসলমানী কবরখানায় থাকার কথা নয়। এই ধাতব চূড়াটি শাহজাহানের পক্ষে পাল্টানো সম্ভব হয়নি, কারণ তাহলে মূল গম্বুজটাকেই ভাঙতে হবে। তাই কোনক্রমে

ত্রিশূলের গায়ে আরবীতে 'আল্লা' শব্দ খোদাই করে তাকে একটা ইসলামী রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

১০। অনেকের মতে তাজমহলে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের বিশেষ নাম ছিল তেজোলিঙ্গ, যেমন সোমনাথের মন্দিরের শিবলিঙ্গের নাম জ্যোতির্লিঙ্গ। তাদের মতে তেজোলিঙ্গ থেকে মন্দিরের নাম হয় তেজোমহালয়, যা থেকে আজকের তাজমহল নাম এসেছে। অনেকের মতে এই শিবলিঙ্গের আরেক নাম ছিল 'অগ্রেশ্বর মহাদেব', যা থেকে আগ্রা শহরের নামকরণ হয়েছে।

১১। আগেই বলা হয়েছে, যেই বেগমের কবরের উপর তাজমহল নির্মিত হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে, সেই বেগমের নাম ছিল আরজুমন্দ বানু। তাকে মমতাজ-উল-জামানি বলেও ডাকা হত। কোন মুসলমান ঐতিহাসিকের রচনার মধ্যে তার মমতাজ মহল নাম পাওয়া যায় না। তাই অনেকে মনে করেন যে, তেজোমহালয়কে তাজমহল করার পর তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করার জন্য মৃত বেগমের নামও একটু পাল্টে 'মমতাজ মহল' করা হয়েছে। যদি ঐ বেগমের নামেই তাজের নাম রাখা হত তা 'মমতাজ মহল' রাখাই অধিকতর সঙ্গত ছিল এবং 'মম' বাদ দেবার কোন প্রয়োজন হোত না। আমরা জানি যে, কোন মানুষের জন্য স্মৃতিসৌধ বানালে সেই মানুষের নামেই সৌধের নাম হয়। কিন্তু তাজমহলের ব্যাপারে ঘটনা ঘটেছে ঠিক উল্টো। আগে তেজোমহালয় থেকে তাজমহল নামকরণ করা হয়েছে এবং সেই তাজমহলের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে বেগমের নাম পাল্টে মমতাজ মহল করা হয়েছে।

১২। তাজমহলের প্রধান ফটকের উপরে রয়েছে নহবৎখানা, এককালে সেখান থেকে সকাল-সন্ধ্যায় শানাই বাজানোর রীতি ছিল। কোন কবরখানায় নহবৎখানার অস্তিত্ব খুবই বেমানান। কারণ কবরখানায় নিস্তব্ধতা রক্ষা করাই নিয়ম।

১৩। বিশাল জায়গা জুড়ে এক সুবৃহৎ পরিসরে (কমপ্লেক্সে) তাজ অবস্থিত। চারপাশে এবং মাটির তলায় রয়েছে অনেক বাড়ীঘর, দালান কোঠা। এই তাজ পরিসরের সঙ্গে আর কোন মুসলীম কবরখানার মিল নেই। মিল আছে পুরী, মাদুরাই, রামেশ্বরম ইত্যাদি স্থানের বিশাল মন্দির পরিসরগুলোর

সঙ্গে। চারপাশের এই সব দালান-কোঠার কোনটা অতিথিশালা, কোনটা গোশালা, কোনটা ভাণ্ডার, কোনটা রন্ধনশালা, কোনটা ঠাকুর-চাকর ও রক্ষীদের বাসস্থান, কোনটা বা কার্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১৪। তাজমহলের নিচের তলায়, যেখানে মমতাজের দেহ শায়িত আছে বলা হয়ে থাকে, একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তার নিচেও আর একটি তলা আছে। সেখানেও অনেক ঘর ও যমুনা পর্যন্ত বারান্দা আছে। ঐ বারান্দা দিয়ে যমুনার বাতাস ও আলো ঐ ঘরগুলোর মধ্যে ঢুকতো। বর্তমানে সেই সব ঘর, বারান্দা ইত্যাদিকে সীল করে দেওয়া হয়েছে। অনেকের বিশ্বাস, ঐ সব সীলকরা ঘরের মধ্যে সাবেক আমলের বিভিন্ন মূর্তি, বিগ্রহ এবং আরও অনেক হিন্দু নিদর্শন ভেঙ্গেচুরে গাদা করে রাখা আছে।

১৯৫৯ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রী এস. আর. রাও আগ্রার আর্কিওলজিক্যাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। সেই সময় তাজের দেওয়ালে একটা ফাটল দেখা দেয় এবং সেটা পরীক্ষা করার জন্য একটু খুঁড়তেই দেওয়ালের ভিতর থেকে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি বেরিয়ে পড়ে। অতি দ্রুত ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দেওয়া হয়। সেই সময় নেহরু সরকারের নির্দেশে নিচের তলায় যাবার রাস্তা নতুন দেওয়াল গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই কারণে অনেকের ধারণা যে, তাজমহলের প্রকৃত পরিচয় তাজের মাটিতেই প্রোথিত রয়েছে। প্রয়োজন শুধু একটা প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের।

১৫। সাবেক আমলে উপরের তলার শিবলিঙ্গকে ঘিরে সোনা ও রত্নখচিত বহুমূল্য একটি রেলিং ছিল। শাহজাহান সেই বহুমূল্য রেলিং সরিয়ে বা আত্মসাৎ করে সেখানে শ্বেত পাথরের রেলিং বসিয়ে দেন। পুরানো রেলিংয়ের দুটো গর্ত আজও তাজের মেঝেতে বিদ্যমান। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারও সেই পুরানো রেলিংয়ের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছেন।[80]

১৬। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে তাজ-পরিসরের বাগানের নক্‌শাও নির্মাণ করেছেন কাশ্মীরের এক ব্যক্তি, নাম রণমল।[81] কিন্তু প্রশ্ন হল তথাকথিত যে সব বিদেশী মুসলমান স্থপতিরা

---

(80) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 795.

মূল তাজের নক্‌শা করল এবং তাজ নির্মাণ করল, তাদের বাদ দিয়ে হঠাৎ কেন একজন হিন্দুকে দিয়ে বাগান তৈরি করা হল?

১৭। বিগত ১৯৭৩ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কের প্র্যাট স্কুলের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক শ্রী মারভিন মিলস আগ্রার তাজ পরীক্ষা করতে আসেন এবং তাজের উত্তরের দরজার কাঠের সামান্য একটু নমুনা সঙ্গে করে আমেরিকায় নিয়ে যান। আমেরিকার ব্রুকলীন কলেজের রেডিও কার্বন ল্যাবরেটরির অধ্যক্ষ ডঃ ইভান উইলিয়ামস-এর তত্ত্বাবধানে ঐ কাঠের নমুনাটির 'কার্বন-১৪' পরীক্ষা করে তার প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা হয়। দেখা যায় যে, তা ১৩২০ থেকে ১৩৯৮ সালের মধ্যে তৈরি। অর্থাৎ শাহজাহানের সময় থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগের তৈরি।

এরকম আরও অনেক প্রমাণ সহকারে দেখানো যায় যে, আজ যে সৌধ তাজমহল নামে পরিচিত শাহজাহানের অনেক আগেই তা বিদ্যমান ছিল এবং একটা শিবমন্দির ছিল। শাহজাহানের সময় ঐ সৌধের মালিক ছিলেন জয়পুরের রাজপুত রাজা জয়সিংহ। খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে চান্দেলরাজ পরমার্দিদেব ঐ শিব মন্দির নির্মাণ করেন এবং পরবর্তিকালে তা জয়পুরের রাজাদের হস্তগত হয়। মানসিংহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করায় জাহাঙ্গীরের সময় পর্যন্ত সেই মন্দির অক্ষত ছিল এবং শাহজাহান অত্যন্ত অন্যায়ভাবে বলপূর্বক তা কেড়ে নিয়ে বেগম মমতাজ-উল-জামানির কবরখানায় পরিণত করে। এ ব্যাপারে আরও বিস্তৃত বিবরণের জন্য পাঠক শ্রীপুরুষোত্তম নাগেশ ওক রচিত Taj–The True Story, The Tajmahal is A Temple Place (ভাষান্তরঃ 'তাজমহল হিন্দু মন্দির', দীপক কুমার ভট্টাচার্য, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলিকাতা) এবং Islamic Havoc in Indian History, দেখতে পারেন।

আমাদের ঐতিহাসিকরা তাজমহলকে নির্ভেজাল ইসলামী স্থাপত্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন বলে বর্ণনা করে থাকেন এবং যে কয়টি লক্ষণের উপর ভিত্তি করে এঁরা তাজকে ইসলামী স্থাপত্য আখ্যা দিয়ে থাকেন তা হল—(১) তাজের শীর্ষে গম্বুজ আছে, (২) তাজ অষ্টকোণযুক্ত

---

(81) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 797.

সৌধ, (৩) তাজের খিলান কৌণিক এবং (৪) তাজের চার কোণায় মিনার আছে।

সাবেক শিবমন্দিরে যে গম্বুজ ছিল তা আবদুল হামিদ লাহোরীর 'বাদশানামা'য় স্পষ্ট উল্লেখ আছে (ইমারৎ-এ-আলিশান ওয়া গুম্বজে)।[82] অষ্টকোণ ও কৌণিক খিলান বিশিষ্ট সৌধ নির্মাণের কারিগরি যে ভারতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং কালে যে তা ভারত থেকেই পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোতে গিয়েছে তা আগেই বলা হয়েছে এবং এই বিষয়ে আর্থার উপহ্যাম পোপের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে (পৃঃ ৬৪ দ্রষ্টব্য)।

বেশীর ভাগ ঐতিহাসিকের ধারণা যে, মিনার তৈরির স্থাপত্য সম্পূর্ণভাবে ইসলামী শৈলীর অন্তর্গত এবং কুতুব মিনার ও গজনীর মিনারকে তাঁরা ইসলামী শৈলী বলে দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে, কুতুব মিনার একটি নির্ভেজাল হিন্দু স্থাপত্য যা বরাহমিহিরের তত্ত্বাবধানে রাজপুত কারিগরেরা তৈরি করেছিল। উপরন্তু গজনীর মিনারও বরাহমিহির তৈরি করিয়েছিলেন এবং রাজপুত কারিগরের অভাবে ঐ মিনার ইট এবং সুরকী দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কুতুব মিনার ও গজনীর মিনার, দুই মীনারই প্রাক্ ইসলামী যুগের তৈরি, তাই সেই মিনারের স্থাপত্যকে কখনই ইসলামী স্থাপত্য বলা চলে না।[83] সব থেকে বড় কথা হল, আমাদের ঐতিহাসিকরা যাকে Indo-Saracenic শিল্প বলে প্রচার করে চলেছেন, আর্থার উপহ্যাম'-এর কথা মেনে নিলে Saracenic শব্দটা বাদ দিতে হয় এবং সমস্ত রকম শিল্পশৈলীকে শুধু Indo শিল্পশৈলী বলতে হয়। এ ব্যাপারে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, যদি ভারতে ১০০ শতাংশ ইসলামীকরণ সম্ভব হত তবে সমস্ত হিন্দু মন্দির নির্মাণশৈলী, সমস্ত স্থাপত্যশৈলী ইসলামীশৈলী বলে পরিচিতি লাভ করত।

যাই হোক, এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আরও দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের ঐতিহাসিকরা সর্বদাই শাহজাহানকে একজন অতিশয় কোমলহৃদয়, সন্তানবৎসল ও প্রেমিক ব্যক্তি বলে প্রচার করে

---

(82) P. N. Oak, Taj Mahal The True Story, Pub. by A. Ghosh, 9-12. (83) গজনীর স্তম্ভ ও বরাহমিহিরের তৈরী Acharya Bapu Vankar, Itihas Darpan, New Delhi, ii, 57.

চলেছেন। আগ্রার দুর্গে বন্দী অবস্থায় শাহজাহান প্রিয়তমা পত্নীর কথা চিন্তা করে নীরবে চোখের জল ফেলতেন। মৃত্যুর সময়ও ভগ্নহৃদয়ে তাজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাঁর মৃত্যু হয়। অতিশয় স্নেহশীল, ক্ষমাশীল এবং পুত্রস্নেহে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আধুনিক সংস্করণ ছিলেন বলেই শাহজাহান ঔরঙজেবের সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর 'শাহজাহান' নাটকে তো তাঁকে প্রায় দেবতা বানিয়ে ছেড়েছেন। আবেগের বসে এঁরা শাহজাহান সম্বন্ধে এমন অনেক কথা লিখেছেন এবং লিখছেন যা অলীক তো বটেই, হাস্যকরও বটে।

তবে এঁদের তেমন দোষ দেওয়া চলে না। বর্তমান লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই সব হিন্দু ঐতিহাসিকদের মধ্যে একজনও ইসলামী শাস্ত্র যথা কোরান, হাদিস ইত্যাদি কোনদিনও পড়ে দেখেননি। তাই মুসলীম মানসিকতা ও মুসলীম ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা হিমালয় সদৃশ। তাঁদের পক্ষে জানাই সম্ভব নয় যে একজন মুসলমান, সে অতিশয় দরিদ্রই হোক আর নবাব বাদশাই হোক, এই জগৎ সংসারকে কি চোখে দেখে। অথবা একজন বিধর্মী হিন্দু কাফেরের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী কি, তার সামান্যতম অনুমান করাও এঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ কথাও বলতে দ্বিধা নেই যে, যে সব হিন্দু ঐতিহাসিক মধ্যযুগীয় ভারতের মুসলীম পরাধীনতার ইতিহাস লিখতে ইচ্ছুক, তাঁদের উচিত সবার আগে কোরান হাদিস পড়ে নেওয়া। অন্যদিক দিয়ে বলা যায়, যে সব হিন্দু ঐতিহাসিকের কোরান হাদিস পড়া নেই, মুসলীম যুগের ইতিহাস লেখার তাদের কোন অধিকার নেই।

ইতিহাসও সেই একই কথা বলছে। ইসলামী তত্ত্ব জানা ছিল না বলেই আমাদের হিন্দু রাজারা পদে পদে ভুল করেছেন, মুসলমান আক্রমণকারীদের দ্বারা পদে পদে প্রতারিত হয়েছেন। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে, কোরান পড়া ছিল না বলেই রাজা পৃথ্বীরাজ পরাজিত মহম্মদ ঘোরীকে হত্যা না করে মুক্তি দিয়েছিলেন; কোরান পড়া ছিল না বলেই রাজা দাহির ৫০০ আরব মুসলমানকে নিজ সৈন্যদলে চাকরি দিয়েছিলেন এবং আরব আক্রমণকালে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন; কোরান পড়া ছিল না বলেই গুরু গোবিন্দ সিং দুই মুসলমান পাঠানকে বিশ্বাস

করেছিলেন এবং তাদের হাতে নিহত হয়েছিলেন; কোরান পড়া ছিল না বলেই রোটাস দুর্গের রাজা হরিকৃষ্ণ শেরশাহকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং দুর্গ হারিয়েছিলেন; কোরান পড়া ছিল না বলেই রাজা শিবাজী ঔরঙজেবের কথায় বিশ্বাস করে প্রতারিত হয়েছিলেন। সব দৃষ্টান্ত একত্র করলে একখানা মহাভারত হয়ে যাবে। আমাদের হিন্দুরাজারা মুসলমানদের সঙ্গে করেছেন মানবিক ব্যবহার আর মুসলমানরা হিন্দু রাজাদের প্রতি করেছিল ইসলামী ব্যবহার।

সেই ধারা আজও সমানভাবেই চলছে। আজও দেখা যায় কোন কোন মুসলমান দেশের নেতারা দিল্লী সফরে এসে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের প্রতি নিন্দাসূচক বক্তব্য রাখেন। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা হিসাবে নিন্দা করেন। আর আমাদের সহৃদয় হিন্দু নেতারা তাতে গদগদ হয়ে পড়েন, তাদের কথায় বিশ্বাস করে যারপরনাই আহ্লাদিত হন।

যদি ইসলামী তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের নেতাদের সামান্যতম জ্ঞানটুকুও থাকত তবে তাঁদের এই সব কথাবার্তার আড়ালে যে ইসলামী চরিত্রটা কাজ করছে তা বুঝে ওঠা তাঁদের পক্ষে সহজ হত। তাহলে তাঁরা বুঝতে পারতেন যে, ঐ সব কথা মুখের বুলিমাত্র, আসল কথা হল, 'কুল্ল মুসলেমিন ইখুয়াতুন', বা সব মুসলমান ভাই ভাই। একজন অ-মুসলমান কাফের কখনও কোন মুসলমানের ভাই হতে পারে না। যে মুসলমান নেতা দিল্লীতে এসে পাকিস্তানের নিন্দা করে গেলেন সেই নেতাই ঘরে ফিরে মোসারফ হোসেনের সঙ্গে টেলিফোনে হাসি-ঠাট্টা করবেন, বলবেন ভারতের হিন্দুদের কেমন বোকা বানালাম।

আমাদের হিন্দু নেতাদের জানা নেই যে, ইসলামী শাস্ত্রই বলছে যে কোন কাফেরের সঙ্গে যে কোন সময় যে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করা যায়। যে কোন কাফেরকে যে কোন সময় যে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায় এবং পরমুহূর্তেই সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা যায়। ইসলামী মতে বিধর্মী কাফের হল ইতর প্রাণীর সমান। গরু-ছাগলের সমান। কাজেই সেই সব গরু-ছাগলকে প্রতিশ্রুতি দেওয়াই বা কি, আর না দেওয়াই বা কি! ইসলামের এই সব নীতি স্বয়ং পয়গম্বর হজরৎ মহম্মদ তাঁর জীবিতকালেই মুসলমানদের হাতেকলমে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। অ-মুসলমান কাফেরদের অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে, অনেক মধুর কথা বলে

ডেকে এনে কি করে তাদের হত্যা করতে হয়, স্বয়ং নবী তা বহুবার, বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে, নিজে হাতে করে মুসলমানদের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। সেই শিক্ষার ফলশ্রুতি হিসাবেই যখন লাহোরের টেবিলে মৈত্রীচুক্তি সই হয়, সেই একই সময় কারগিলে সেই চুক্তি পরিত্যক্ত হয়।

আজকের বাংলাদেশ সেই বিশ্বাসঘাতক মুসলীম চরিত্রের এক জ্বলন্ত নিদর্শন। যেই ভারতীয় সেনা রক্ত দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে অত্যাচারী পাকিস্তানী সেনার হাত থেকে মুক্ত করল, সেই ভারতের নাম বাংলাদেশের কোন মুসলমান নেতার মুখে আজ শোনা যায় না। বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে যে সরকারী বক্তব্য রাখেন তাতে সযত্নে ভারতের নাম বর্জন করা হয়। যেই পাকিস্তান সরকার তাদের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল, সেই পাকিস্তানী সরকারই আজ বাংলাদেশের পরম মিত্র। মূল সূত্র সেই কুল্ল মুসলেমিন ইখুয়াতুন, যেই বাণী মহানবী তাদের কানে দিয়ে গিয়েছেন।

এ ব্যাপারে আরও একটা কথা বলার আছে। যে সময় মুসলমানরা ভারত আক্রমণ করেছিল সে সময় ছাপাখানা ছিল না। বই হাতে লিখে নকল করতে হত। তাই কোরান-হাদিস তখন সহজলভ্য ছিল না। উপরন্তু তখনকার সেই সব কোরান-হাদিস আরবী ভাষায় লেখা হত বলে সব হিন্দুর পক্ষে তা পড়াও সম্ভব ছিল না। উপরন্তু কোন কাফেরের পক্ষে কোরান স্পর্শ করা পাপ। মুসলমান শাসিত সেই সময়কার ভারতে এই পাপের কি শাস্তি হত তাও অনুমান করা চলে। এই সমস্ত কারণে হয়তো তখনকার হিন্দু রাজাদের পক্ষে কোরান-হাদিস পড়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু আজ সেই যুক্তি চলে না। ইংরাজী ভাষায় তো বটেই, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাতেও কোরান ও হাদিসের অনুবাদ আজ একটু চেষ্টা করলেই পাওয়া যায়। কাজেই আজকের হিন্দু ঐতিহাসিক ও হিন্দু রাজনীতিকদের তো বটেই, প্রতিটি হিন্দুর উচিত কোরান ও হাদিস পড়ে ফেলা। প্রতিটি হিন্দুকে এটা সব সময় মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল হিন্দু জাতিকে নির্মূল করা এবং হিন্দু সংস্কৃতিকে সমূলে ধ্বংস করে ইসলাম বা ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটানো। তাই ইসলামের চেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু হিন্দুর দ্বিতীয় নেই। সেই শত্রুকে চিনতে

হবে, জানতে হবে, তবেই সেই ভয়ঙ্কর শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করা যাবে, বেঁচে থাকা যাবে, হিন্দু সংস্কৃতিকে রক্ষা করা যাবে।

বিগত হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দু বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন করেছে, কালী-কৃষ্ণ নাম জপ করেছে। কিন্তু মুসলমান আক্রমণের সময় নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি। সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করে গজনীর মামুদ লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে হত্যা করেছে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু নারী ও শিশুকে ক্রীতদাস হিসাবে নিয়ে গেছে, হিন্দু নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। স্বামী বিবেকানন্দের হিসাব মত মুসলমানরা ৬০ কোটি হিন্দুর মধ্যে ৪০ কোটি হিন্দুকে কেটে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে। হিন্দুর এই নির্যাতনের একটা প্রধান কারণ সে কোনদিনও মুসলমানদের মূল তত্ত্বকে জানতে চেষ্টা করেনি এবং সেই কারণে উপযুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হযেছে।

তাই সমস্ত পূজা-অর্চনা বন্ধ রেখে হিন্দুকে অন্তত আগামী দশ বছর শুধু ইসলাম চর্চা করতে হবে। ইসলামকে জানতে হবে। কোরান-হাদিস পড়তে হবে। সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর শত্রুর মূল চাবিকাঠি, মূল চালিকা শক্তিকে জানতে হবে। তবেই হিন্দু আসন্ন সঙ্কটের উপযুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে। সঠিকভাবে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করতে পারবে। আত্মরক্ষা করতে পারবে, হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে পারবে, হিন্দু সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারবে। অন্যথায় হয় মরতে হবে, নয় তো আবদুল, নুরুল বা মৈনুল হয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

যাই হোক, শাহজাহানের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যেতে পারে। আমাদের ঐতিহাসিকরা শাহজাহানকে যতই ভাল মানুষ সাজাবার চেষ্টা করুন না কেন, আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, তিনি ছিলেন কলেমা পড়া এবং নামাজ ও রোজাকারী একজন মুসলমান। তুর্কী ও মোঙ্গল মিশ্রণে তৈরি একজন বিদেশী। ভারতবর্ষ ছিল তাঁর লুণ্ঠন-ভূমি, মাতৃভূমি নয়। তাঁর লক্ষ্য ছিল হিন্দু কাফের হত্যা করে গাজী হওয়া। হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করে আল্লার নাম রোশন করা এবং সমস্ত ভারতে আল্লার রাজত্ব কায়েম করা।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলার আছে। মরু সদৃশ ও পশুপালকদের দেশ আরবে হয়েছিল ইসলামের অভ্যুদয়। তাই ইসলাম হল নৃশংস পশুপালক সংস্কৃতি। তাই প্রতিটি মুসলমানের মধ্যেই সেই পশুপালকের নৃশংসতা কম-বেশী থাকতে বাধ্য। যে শাহজাহানকে

আমাদের ঐতিহাসিকের দল নিরীহ ভাল মানুষ সাজাতে চাইছেন, সেই শাহজাহানও এর উর্ধ্বে নয়।

পিতা জাহাঙ্গীর নিজ ঔরসজাত পুত্র খুসরুকে অন্ধ করে দিয়েছিল। সিংহাসনে বসে সেই নিরীহ ভাল মানুষ শাহজাহান খুসরুর অন্ধ হয়ে বেঁচে থাকাটাও যথেষ্ট নিরাপদ বলে মনে করতে পারলেন না। তাই নিজ হাতে তাকে হত্যা করলেন। আর এক প্রতিপক্ষ শাহরইয়ারকে অন্ধ করে দিলেন। অনেকের মতে, শাহরইয়ার সহ অন্য দুই চাচাত ভাইকেও শাহজাহান হত্যা করেন।[84]

শাহজাহান প্রায়ই অন্যান্য ধর্মের সাধু-সন্তদের ধর্মকথা শোনার নাম করে আগ্রায় ডেকে আনতেন। কিন্তু শাহজাহানের ফাঁদে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের মুসলমান হবার হুকুম দিতেন। যারা হুকুম মেনে নিত তারা মুসলমান হয়ে বেঁচে যেত। বাকীদের পরদিন সকালেই নানা রকম পৈশাচিক অত্যাচার করে মেরে ফেলা হত। সব থেকে বেশী অবাধ্যদের হাতীর পায়ের তলায় পিষে ফেলা হত।[85]

ঐতিহাসিক Keene লিখছেন, ''Shahjahan surpassed all the Mughal emperors in autocratic pride and was the first of them to safeguard the throne by murdering all possible rivals......According to (Sir Thomas) Roe, who knew Shahjahan personally, his nature was unbending and mingled with extreme pride and contempt of all.''[86] —অর্থাৎ, "দম্ভ ও স্বেচ্ছারিতায় শাহজাহান সকল মোগল সম্রাটকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তিনিই হলেন প্রথম মোগল সম্রাট, যিনি সিংহাসনকে নিষ্কণ্টক করতে সকল সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাইকারী দরে হত্যা করেছিলেন।....স্যার টমাস রো সম্রাট শাহজাহানকে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। তাঁর মতে, শাহজাহান ছিলেন অনমনীয় দম্ভ ও চূড়ান্তভাবে গর্বিত এক অহঙ্কারী মানুষ এবং নিজেকে ছাড়া আর সকলের প্রতি তাঁর ছিল অসীম ঘৃণা।" শ্রী Keene আরও লিখছেন, ''Shahjahan, in open rebellion (against his own father Emperor Jahangir) seized Fatehpur Sikri and sacked the city

(84) Keene's Handbook, ibid, 38. (85) Trans. Arch. Soc. Agra, (1978), Jan -June, viii-ix. (86) Keene's Handbook, ibid, 25.

of Agra, where, according to Della Valle, a noble Italian then on a visit to India, his army committed fearful barbarities. The citizens were compelled under torture to give up their hoarded treasurers, and many ladies of quality were outraged and mutilated.''[86]—অর্থাৎ, "শাহজাহান পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ফতেপুর-সিক্রি অবরোধ করেন এবং আগ্রা দখল করেন। সেই সময় ডেলা ভেল নামে ইটালীর এক অভিজাত পর্যটক আগ্রায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর মতে শাহজাহানের সৈন্যরা তখন বিভীষিকাময় বর্বরতার অনুষ্ঠান করে। নির্মম অত্যাচারের মধ্য দিয়ে তারা (হিন্দু) প্রজাদের সর্বস্ব লুট করে এবং অভিজাত রমণীদেরও অত্যাচার ও অঙ্গচ্ছেদ করে।" এখানে 'রমণী' বলতে সবই হিন্দু রমণী বুঝতে হবে এবং 'অত্যাচার' বলতে বলাৎকার এবং 'অঙ্গচ্ছেদ' বলতে স্তন কেটে ফেলা বুঝতে হবে।

মাত্রাতিরিক্ত লাম্পট্য, মিথ্যাচার, অবাধ্যতা ও দুষ্কর্মের জন্য জাহাঙ্গীর যুবরাজ খুরম (পরে শাহজাহান)-কে শয়তান (Wretch) বলে ডাকতেন। জাহাঙ্গীর তাঁর রচিত 'জাহাঙ্গীরনামা'য় লিখছেন, ''I directed that henceforward he should be called 'wretch' and whenever the word 'wretch' occurs in the Ikbalnama, it is he who is intended.''[87] —অর্থাৎ, "আমি এই আদেশ দিলাম যে, এখন থেকে সবাই তাকে (শাহজাহানকে) শয়তান বলে ডাকবে। উপরন্তু আমার 'ইকবালনামা'য় যেখানে যেখানে 'শয়তান' শব্দ আসবে সেখানে সেখানে শয়তান বলতে শাহাজাহানকে বুঝতে হবে।" হিন্দু মন্দির ধ্বংস করার মত বর্বরতাও তার মধ্যে কিছু কম ছিল না।

আবদুল হামিদ লাহোরী তাঁর 'বাদশানামা'য় লিখছেন, ''It had been brought to the notice of His Majesty that during the reign of his father many idol temples had been begun but remained unfinished at Benares, the great stronghold of infidelity. The infidels were now desirous of completing them.

(87) H. M. Elliot and Ja Dowson, ibid, VI, 281.

His Majesty, the defender of the faith (of Islam) gave order that at Benares, and throughout all his dominion in every place, all temples that had been begun should be cast down. It was now reported from the province of Allahabad that seventy six temples had been destroyed in the district of Benares.''(88)—অর্থাৎ, "একদা বাদশাহের গোচরে আনা হল যে, তার বাবা (জাহাঙ্গীর)-এর আমলে বিধর্মী কাফেরদের শক্ত ঘাঁটি বারাণসীতে অনেক পুতুল পূজার মন্দির তৈরি শুরু হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত অসমাপ্তই থেকে যায়। কিন্তু বর্তমানে কাফেরের দল সেই সব মন্দির তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ করার উদ্যোগ নিয়েছে শুনে ধর্মের (ইসলামের) রক্ষক, মহানুভব সম্রাট আদেশ জারি করলেন যে, বারাণসী সহ তার রাজ্যের যেখানে যেখানে আধাআধি মন্দির খাড়া করা হয়েছে তা সব ভেঙে ফেলতে হবে। অধুনা খবর এসেছে যে, তার আদেশ বলে এলাহাবাদ প্রদেশের বারাণসী জেলায় ৭৬টি মন্দির ভেঙে ফেলা হয়েছে।"

শ্রী কানোয়ার লাল লিখছেন, ''Shahjahan was professedly a strict sunni, and probably at the instigation of Mumtaj Mahal, he had renewed the destruction of Hindu temples.''(89) —অর্থাৎ, "শাহজাহান ছিলেন একজন অত্যন্ত গোঁড়া সুন্নী মুসলমান এবং সম্ভবত পত্নী মমতাজ মহলের পরামর্শে তিনি নতুন করে হিন্দু মন্দির ভাঙার কাজ শুরু করেন।" কিন্তু মন্দির ধ্বংসকারী দানবরূপী এই শাহজাহানকে আমাদের ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করছেন বিশাল এক নির্মাণকারী ''as a great builder'',(90) হিসাবে।

মুসলমান হিসাবে শাহজাহান কতখানি উগ্র ও গোঁড়া ছিলেন তা আর একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাল বোঝা যাবে। ১৬৩২ সালে কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে সম্রাটের নজরে আনা হল যে, রাজৌরি, ভিম্বর ও গুজরাটের কোন কোন স্থানে হিন্দুরা মুসলমান মহিলাদের পত্নীরূপে

---

(88) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, VII, 36. (89) Kanwar Lal, ibid, 26. (90) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 783.

গ্রহণ করছে এবং বিয়ে করার পর সেই সব মুসলমান রমণীদের আবার হিন্দু করে ফেলছে। শুনে সম্রাটের ভীষণ ক্রোধ হল। সম্রাটের আদেশে অচিরেই সেই সব হিন্দুদের ধরে আনা হল। প্রথমে এত বিশাল অর্থ জরিমানা করা হল, যাতে তারা কেউ তা দিতে না পারে। তখন তাদের বলা হল যে, একমাত্র ইসলাম গ্রহণ করলেই তাদের মুক্তি দেওয়া হবে এবং স্ত্রীকে নিয়ে ঘর সংসার করতে দেওয়া হবে। অন্যথায় মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। প্রায় সকলেই ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় তাদের হত্যা করা হল। এইভাবে প্রায় ৪৫০০ রমণীকে পুনরায় মুসলমান করা হল।[90A]

১৬৩৫ সালে সম্রাটের কাছে খবর এল যে, জিনাব নামে একটি মুসলমান হিন্দু মেয়েকে হিন্দু করে গঙ্গা নাম রাখা হয়েছে এবং সিরহিন্দের দলপৎ নামে এক যুবক তাকে বিয়ে করেছে। শাহজাহানের আদেশে তৎক্ষণাৎ তাদের ধরে আনা হল। ইতিমধ্যে তাদের ৭টি সন্তানের জন্ম হয়েছে (৬টি মেয়ে ও ১টি ছেলে)। সম্রাটের আদেশে দলপৎকে হত্যা করা হল এবং জিনাব ও তার ৭টি সন্তানকে পুনরায় মুসলমান করা হল।[90A]

ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের মতে আকবরের হারেমে ৫০০০ রমণী ছিল। বাবার মৃত্যুর পর বাদশা হয়ে জাহাঙ্গীর ঐ হারেমের মালিক হল এবং রমণীর সংখ্যা ১০০০ বাড়িয়ে ৬০০০ করল।[91] শাহজাহান বাদশা হয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে সেই হারেমের মালিক হলেন। সাধারণতঃ হিন্দুর ঘরের রমণীদেরই এই অভিশপ্ত হারেমে স্থান হত। কারণ ইসলামের নিয়মই হল, যুদ্ধে জয়ী হলে (১) সকল সক্ষম পুরুষ বন্দীকে হত্যা করতে হবে, (২) নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস হিসাবে বেচে দিতে হবে এবং (৩) বিজিতের সমস্ত সম্পত্তি (গণিমতের মাল) ভোগ-দখল করতে হবে। নারী বন্দীদের মধ্যে সুন্দরী যুবতীদের এই সব লম্পট বাদশারা নিজেদের হারেমে অথবা অন্যান্য আমির ওমরাহদের হারেমে পাঠিয়ে দিত এবং বাকীদের ক্রীতদাসী হিসাবে বেচে দিত। এইভাবে নতুন নতুন রমণীর দ্বারা হারেমের নবীকরণ হত এবং পুরানো ও বয়স্কাদের গৃহপালিত পশুর মতই তাড়িয়ে দেওয়া হত। নূরজাহানের বাবা ইদমৎ-উদ্-দৌলার মতে এই সব হতভাগিনী হারেম-বাসিনীদের

(90A) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 312.
(91) V. A. Smith. ibid, 359.

কন্যা সন্তান জন্মালে তাদের হারেমেই রাখা হত এবং বড় হলে বাদশাদের ভোগে লাগত। আর পুত্র সন্তান জন্মালে সারা জীবনের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করা হত অথবা মেরে ফেলা হত।[92]

সেই যুগে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক পি. এন. চোপরা লিখছেন, ''Polygamy was the priviledge of the rich Muhammadans, most of whom kept 3 to 4 wives at a time....A man (i.e. a Muhammadan) might marry any number of wives by mutah but only four by nikah.''[93] —অর্থাৎ, "তখনকার দিনে সকল ধনী মুসলমানই বহু-বিবাহ প্রথার সুযোগ গ্রহণ করতো এবং ৩ থেকে ৪ জন স্ত্রীকে বিবাহ করতো। মুসলমানী আইন অনুসারে যে কোন মুসলমান পুরুষ ৪ জন রমণীকে 'নিকা' করতে পারে, কিন্তু যতজন ইচ্ছা রমণীর সঙ্গে 'মুতা' বিবাহ করতে পারে।" মুসলমান সমাজে দুরকমের বিবাহ প্রথা চালু আছে—(১) নিকা আর (২) মুতা। মুসলমানদের মধ্যে বিবাহ একটা সামাজিক চুক্তি মাত্র এবং স্বামী তিনবার 'তালাক' শব্দ উচ্চারণ করলে বিবাহ চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায় এবং স্থান কাল নির্বিশেষে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। 'নিকা'র বিবাহ চুক্তি স্থায়ী চুক্তি এবং তালাক না দেওয়া পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু 'মুতা'র বিবাহ চুক্তিটাই অস্থায়ী এবং চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আপনা-আপনিই তালাক হয়ে যায়। একদিন, এক সপ্তাহ এমন কি দুই এক ঘণ্টার জন্য এই বিবাহ চুক্তি হতে পারে।

নিকা কিংবা মুতা দুই ক্ষেত্রেই স্ত্রীকে 'দেনমোহর' দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। নিকার ক্ষেত্রে, যখন নিকানামা লেখা হয় তখন এই দেন মোহর টাকার অঙ্কে নিকা নামায় লেখা হয়। স্বামী কোনদিন স্ত্রীকে তালাক দিলে ঐ দেনমোহরের টাকা সে স্ত্রীকে দিতে বাধ্য থাকে। মুতার ক্ষেত্রে এক মুষ্টি খেজুর বা এক মুষ্টি আটা, এমন কি গায়ের জামাটাও দেনমোহর হিসাবে দেওয়া চলে। নবীর জীবিতকালে বান্দারা দূরদেশে জেহাদ করতে গেলে নারীসঙ্গের অভাবে কষ্ট পেত। তাই পরম দয়ালু দয়াময় আল্লা তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য স্থানীয় রমণীদের সঙ্গে এই মুতা বিবাহের প্রচলন করেন।[94]

---

(92) P. N. Oak, Taj Mahal–The True Story, ibid, 207. (93) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 700. (94) Hadis, Muslim : 3248, 3249, 3251

যাই হোক, এই সব কথাবার্তার অবতারণা এই জন্য যে, হারেমের ৬০০০ রমণীর মধ্যে কেউ নিকা করা বিবি ছিল না। মুতা ইত্যাদি বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে এইসব রমণীদের রক্ষিতা বলাই সঙ্গত। অনেক মুসলমান ঐতিহাসিক এই দাবি করেন যে, আকবর বাদশা তাঁর হারেমের ৫০০০ রক্ষিতার জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এই সব কথা চাটুকার সভাসদ ঐতিহাসিকদের বুলিমাত্র। দিল্লী বা আগ্রায় এমন কোন প্রাসাদ নেই যেখানে এই ৫০০০ রমণীকে পৃথক আশ্রয় দেবার মতো ৫০০০ ঘর আছে। কাজেই এই সব হতভাগিনীদের জীবনযাত্রা কিভাবে নির্বাহ হত তা সহজেই অনুমান করা চলে।

আরজুমন্দ বানু ছাড়া শাহজাহানের আরও অনেক নিকা করা বিবি ছিল। তাজমহলের চত্বরের মধ্যেই আরও দুজন নিকা করা বিবির কবর রয়েছে। এরা হল সতিউন্নেসা খানম ও সরহন্দি বেগম। এছাড়া আরজুমন্দ বানুর এক খাস পরিচারিকার কবরও তাজপরিসরের মধ্যে রয়েছে।[95] এখানে যা উল্লেখযোগ্য তা হল, বেগম সতিউন্নেসা ও উক্ত পরিচারিকার কবর দুটি হুবহু এক রকম। তাই প্রশ্ন করা চলে যে, একজন দাসীর সঙ্গে বেগমের কবর দিয়ে শাহজাহান কি দাসীর মর্যাদা বাড়িয়েছেন না বেগমের মর্যাদাকে খর্ব করেছেন? শুধু তাই নয়, তাঁর এই কাজ তাঁর প্রিয়তমা পত্নী আরজুমন্দ বানুর মর্যাদাকেও যে অপমানিত করেছে তা বলাই বাহুল্য। তাই আরও একটি গুরুতর প্রশ্ন এসে যায়—যে পত্নীকে শাহজাহান এত ভালবাসতেন, যার স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে এত টাকা খরচ করে তাজমহল তৈরি করলেন, সেই বেগমকে সেই তাজমহলের চত্বরের মধ্যেই অপমানিত করা হল কেন?

ইতালীর ভেনিস শহরের পর্যটক মানুচ্চি তাঁর ভ্রমণ কাহিনী ''Storia do Mogor''-এ লিখছেন, ''Numerous scandals connected with the private life of Shahjahan depict him as a man of despicable character, whose only concern in life was how to indulge in bestial sensuality and monstrous lewdness.''[96] —অর্থাৎ, "সেই সময় শাহজাহানের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এত কুৎসা প্রচলিত ছিল যে, তা থেকে এটাই বোঝা যেত যে সম্রাট একজন

---

(95) Kanwar Lal, ibid, 69. (96) Kanwar Lal, ibid, 26.

ঘৃণ্য চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তা ছাড়া এটাও বোঝা যেত যে, দানবীয় কামুকতা ও পশুবৎ উগ্র কামনা চরিতার্থ করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।"

ইয়োরোপের আরেক পর্যটক Francois Bernier তাঁর ভ্রমণ কাহিনী 'Travels in The Mughal Empire'-এ লিখেছেন, "The frequent fancy (mina) bazars in the palace, where hundreds of abducted Hindu women were bought and sold and presented with Emperor, the maintenance of a large number of dancing girls by the state, the presence of hundreds of (castrated) male servants in the harem were the objects for the satisfaction of Shahjahan's lust."[96]—অর্থাৎ, "প্রাসাদের মধ্যে ঘন ঘন 'মিনা বাজার' বসিয়ে সেখানে জোর করে ধরে আনা হাজার হাজার হিন্দু রমণী বেচা-কেনা, সম্রাটের জন্য ধরে আনা শত শত হিন্দু রমণীকে উপহার হিসাবে গ্রহণ করা, সরকারী খরচে বেশ কয়েক'শ নৃত্য পটীয়সী বেশ্যার ভরণপোষণ, হারেম সুরক্ষার জন্য বেশ কয়েক'শ খোজা প্রহরী নিয়োগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কামুক শাহজাহান তাঁর কামনা ও লালসার পরিতৃপ্তি লাভ করতেন।"

মানুচ্চিও আরও লিখেছেন,"It would seem as if the only thing Shahjahan cared for was the search for women to serve his pleasure."[96] —অর্থাৎ, "(এসব ঘটনা থেকে) এটাই মনে হয়, শাহজাহানের জীবনের একটাই লক্ষ্য ছিল তা হল, লালসা চরিতার্থ করার জন্য নারীদেহের খোঁজ করা।" এই প্রসঙ্গে মানুচ্চি আরও লিখেছেন যে, শাহজাহানের দুই সভাসদ জাফর খাঁ ও খালিলুল্লা খাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে শাহজাহানের অবৈধ সম্পর্ক ছিল।[96] ইয়োরোপের আরেক পর্যটক সেবাস্তিয়ান মানরিক তাঁর ভ্রমণ কাহিনী 'The Travels of Sebastian Manrique'-এ লিখেছেন যে, শ্যালক সায়েস্তা খাঁর স্ত্রীর সঙ্গে শাহজাহানের গোপন সম্পর্ক ছিল। তিনি আরও লিখেছেন যে, জাফর খাঁর স্ত্রীকে শাহজাহানের প্রাসাদের দিকে যেতে দেখলে রাস্তার লোকেরা চীৎকার করত আর বলত, "শাহজাহানের সকালের জলখাবার যাচ্ছে"। তেমনি খলিলুল্লা খাঁর স্ত্রীকে শাহজাহানের প্রাসাদের দিকে

যেতে দেখলে তারা বলত, “শাহজাহানের দুপুরের খাবার যাচ্ছে”।[97] আরেক পর্যটক পিটার মুণ্ডির মতে নিজের ছোট মেয়ে চমনি বেগমের সঙ্গে শাহজাহানের অবৈধ সম্পর্ক ছিল।[97]

বড় মেয়ে জাহানারার সঙ্গে যে শাহজাহানের অবৈধ সম্পর্ক ছিল এ ব্যাপারে অনেক ঐতিহাসিকই একমত। শাহজাহান তাঁর এই সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যেই বলতেন এবং যুক্তি দেখাতেন যে, গাছে ফল ধরলে বাগানের মালীরই অধিকার সবার আগে তার স্বাদ গ্রহণ করার।[97] পর্যটক বার্ণিয়েঁ এ ব্যাপারে লিখেছেন,"Begum Sahiba, the elder daughter of Shahjahan, was very handsome and of lively parts, and passionately beloved by her father. Rumour has it that his attachment reached a point which it is difficult to believe, the justification of which rests on the decision of Mullahs or the doctors of Islamic law. According to them, it would have been unique to deny the king the priviledge of gathering fruits from the tree he had himself planted."[97]

—অর্থাৎ, “শাহজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেগম সাহেবা অতীব সুন্দরী এবং অতিশয় প্রাণ-চঞ্চলা ছিলেন। পিতা শাহজাহান তাঁকে উন্মত্তের মত ভালবাসতেন। তখন এই জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল যে, তাঁদের এই ঘনিষ্ঠতা একটা অবিশ্বাস্য পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং ইসলামী আইন অনুসারে তা কতখানি ন্যায়সঙ্গত ছিল তা শুধু মোল্লাদের তথা ইসলামী আইনজ্ঞদের পক্ষেই বলা সম্ভব ছিল। বাদশা যুক্তি দেখাতেন, “বাগানের গাছে ফল ধরলে যে মালী সেই গাছ লাগিয়েছে তারই অধিকার সবার আগে সেই ফলের আস্বাদ গ্রহণ করা।” মনে হয় মোল্লা-মৌলবীদের পক্ষেও এ যুক্তি খণ্ডন করা সম্ভব হত না।

কাজেই প্রশ্ন দাঁড়ায়, এত হাজার হাজার হারেমবাসিনী রক্ষিতা, এত বেগম এবং অন্যান্য পরস্ত্রীর সঙ্গে যেই শাহজাহান ফূর্তি করতেন, সর্বোপরি নিজের ঔরসজাত একাধিক কন্যার সঙ্গে যেই শাহজাহান শোয়া-বসা করতেন, এমন একজন চূড়ান্ত লম্পট ব্যক্তির পক্ষে কোন একজন বিশেষ বেগমের সঙ্গে রোমান্টিক প্রেম গড়ে ওঠা কি সম্ভব ছিল? কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আরজুমন্দ বানুর সঙ্গে তাঁর

(97) Kanwar Lal, ibid, 27.

রোমিও-জুলিয়েটের মত রোমান্টিক প্রেম গড়ে ওঠা, তার কবরের উপর প্রেমের নিদর্শন তাজমহল তৈরি করা এবং সেই তাজমহলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মৃত বেগমের দুঃখে চোখের জল ফেলা ইত্যাদি সমস্তই বানানো গল্প মাত্র। এর মধ্যে সত্যতার লেশমাত্র নেই। কিন্তু দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এই সব সর্বৈব মিথ্যা, অলীক গল্প মানুষের মনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিশ্বকবির কবিতা— "শুধু তব নয়নের জল, কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল, এ তাজমহল"। তবে এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, শাহজাহানের প্রকৃত জীবন-চরিত্র জানা থাকলে কবি কখনও এই কবিতা লিখতে পারতেন না।

এ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে শাহজাহান কতখানি দয়াবান লোক ছিলেন সে ব্যাপারে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। আমরা আগেই দেখেছি যে, চান্দেল রাজ পরমার্দিদেব আগ্রায় সম্পূর্ণ শ্বেতপাথরের তৈরি যে মর্মর শিব মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন, তাকেই সামান্য রদবদল করে শাহজাহান পত্নী আরজুমন্দ বানুর কবরখানায় পরিণত করেছেন। এই কাজের জন্য কত শ্রমিক কত দিন কাজ করেছে তার কোন প্রকৃত তথ্য অনুপস্থিত। তাভার্নিয়েঁ তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বলে গেছেন ২০,০০০ শ্রমিক ২২ বছর কাজ করেছে এবং সেটাকেই সবাই, বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগৎ সঠিক তথ্য বলে মেনে নিয়েছে। আর পাশ্চাত্য যা মেনে নিয়েছে আমাদের ঐতিহাসিকরাও তাকেই 'তা বটে, তা বটে, তা বটে ঠিক' বলে চলেছেন।

যাই হোক, কি অবস্থার মধ্যে সেই শ্রমিকরা কাজ করতে বাধ্য হয়েছে সে ব্যাপারে তাভার্নিয়ঁর মত হল, "The labour was all forced and very little payment made in cash to the 20,000 workmen, who were said to have been employed for 17 years."(98) —অর্থাৎ, "শ্রমিকদের সকলকেই জোর করে খাটতে বাধ্য করা হত এবং সেই ২০,০০০ শ্রমিক, যারা এক নাগাড়ে ১৭ বছর ধরে কাজ করেছে বলে বলা হয়ে থাকে তাদের যৎসামান্য বেতন দেওয়া হত।" Keene সাহেবের মতে, "The labour was forced and little was paid to

---

(98) As quoted in 'Guide to Taj At Agra', ibid, 14.

the workmen in cash, while their allowances of cash was curtailed by the rapacions officials. So great was their distress and so frightful the mortality among them that they must have cursed the memory of Mumtaj and cried out in dispair:

Have mercy, God, in our distress,
For we die too, with the Priness.''(99)

—অর্থাৎ, "শ্রমিকদের জোর করে খাটানো হত এবং অত্যন্ত কম বেতন দেওয়া হত। উপরন্তু লোভী সরকারী কর্মচারীরা পারিশ্রমিকের একটা বড় অংশ কেটে নিত। তাদের দুর্দশা এত শোচনীয় ছিল এবং তাদের মৃত্যু হার এত বেশী ছিল যে, তারা সম্ভবত নিজেদের দুর্দশার জন্য মৃত বেগমকেই অভিশম্পাত করত এবং বলত—

হে ভগবান, দয়া কর, আমাদের দুর্দশার লাঘব কর,
অন্যথায় বেগমের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মারা পড়ব।"

এর পর আছে কারিগরদের হাত কেটে দেবার গল্প, যাতে তারা দ্বিতীয় তাজ গড়তে না পারে। এই গল্প যদি আংশিক ভাবেও সত্য হয় তবে শাহজাহানকে জল্লাদ ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি না তা সুধীজনের বিচার্য।

১৬২৮ থেকে ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ৩০ বছর শাহজাহানের রাজত্বকাল বিস্তৃত ছিল এবং আমাদের ঐতিহাসিকরা এই সময়টাকে ভারতের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে বর্ণনা করে থাকেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে সাধারণ প্রজারা কতটা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল, তা বিচার করে এঁরা তাকে স্বর্ণযুগ বলেন না। তাঁরা একে স্বর্ণযুগ বলেন সম্পূর্ণ অন্য এক কারণে। কথায় বলে, একটা মিথ্যা কথা বললে তাকে ঢাকতে আরও দশটা মিথ্যার প্রয়োজন হয় এবং এই দশ মিথ্যার প্রধান মিথ্যা হল, শাহজাহানের শাসনকাল ভারতের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ ছিল।

শাহজাহান তাজমহল, লালকেল্লা, ময়ূর সিংহাসন ইত্যাদি তৈরি করেছেন, এই সব মিথ্যা তাঁরা আগে থেকেই বলে রেখেছেন। সেই সব মিথ্যাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যই শাহজাহানের শাসনকালকে প্রাচুর্যের যুগ দেখানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই "শাহজাহানের

---

(99) Keene's Handbook, ibid, 154.

শাসনকাল ভারতের সুবর্ণযুগ” এই ভাঙা রেকর্ড তাঁরা অবিরাম বাজিয়ে চলেছেন।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হল এই যে, শাহজাহান সহ সমস্ত মোগল বাদশাগণ এবং তাঁদের আমির ওমরাহের দল যে বিলাসিতা করত, সাধারণ প্রজারাই তার ব্যয় বহন করত। এই সাধারণ প্রজাদের প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু কৃষক। এদের ধন-সম্পদ ও উৎপন্ন শস্য লুণ্ঠন করে রাজকোষ ভরিয়ে তোলাই ছিল ঐ সব বিদেশী মুসলমান শাসকদের একমাত্র কাজ। এর থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে, যেই বাদশা যত বেশী বিলাসিতা করতেন বা রাজকোষের টাকা বেশী খরচ করতেন তাঁকে তত বেশি করে গরীব প্রজাদের লুণ্ঠন করতে হত।

কাজেই শাহজাহানের সময় ভারতের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ ছিল, এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। সমগ্র মুসলমান শাসনের সময়টাই ছিল সাধারণ হিন্দু প্রজাদের কাছে চরম দারিদ্র্য ও মহা আতঙ্কের যুগ। তারা দুই ভাবে লুণ্ঠিত হত, প্রথমতঃ দিল্লীর কর ও জিজিয়ার দ্বারা এবং দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় শাসকদের কর, অন্যায় উৎপীড়ন ও লুণ্ঠনের দ্বারা। তার উপরে ছিল প্রতিনিয়ত বিনাশের আশঙ্কা। তাই শ্রীআশীর্বাদীলাল শ্রীবাস্তব লিখেছেন, ''The masses and inferior artisans were, on the other hand, poor, but they did not starve except in times of drought and scarcity.''(100) — অর্থাৎ, “সাধারণ শ্রমিক বা দিন-মজুররা সবাই ছিল গরীব, তবে খরা বা অভাবের সময় ছাড়া তাদের অনাহারে থাকতে হত না।”

এখানে শ্রীবাস্তব মহাশয় শাহজাহানের সম্মান রক্ষার্থে ‘আকাল’ শব্দের বদলে ‘খরা’ ও ‘অভাব’ শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন। যাই হোক, এই সব আকালের সময় কোটি কোটি গরীব হিন্দু প্রজা মারা যেত এবং বাদশারা তার কিছুমাত্র প্রতিকার করার চেষ্টা করত না। এই সব দুর্ভিক্ষ অনেক সময় বছরের পর বছর ধরে চলত। হিন্দু প্রজা মারা গেলে মুসলমান শাসকদের কোন দুশ্চিন্তা হবার কথা নয়। বরং খুশি হবারই কথা, কারণ যে কাজ তাদের তরোয়াল দিয়ে করতে হত, সে কাজ প্রকৃতি নিজেই করে পরিশ্রম লাঘব করে দিচ্ছে। হিন্দু মরলেই ইসলামের লাভ, তা তরোয়ালের আঘাতেই মরুক আর আকালেই মরুক।

---

(100) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 735.

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা ভাল বোঝা যাবে। মানসিংহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছিল বলে তার রাজপুত সৈন্যরা মোগলের হয়ে যুদ্ধ করত। ১৫৭৬ সালে রানা প্রতাপের সঙ্গে হলদীঘাটের যুদ্ধের সময় বদায়ুনী নামে এক ব্যক্তি সেনাপতি আসফ খাঁর কাছে অভিযোগ করল যে, শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষের রাজপুতদের ঠিকমত চেনা যাচ্ছে না, তাই তীর চালাতে অসুবিধা হচ্ছে। তখন আসফ খাঁ তাকে বলল যে, অত বাছ-বিচার করার দরকার নেই, তীর চালাতে থাকো। কোন্ পক্ষের রাজপুত মরল তা দেখার দরকার নেই। যেই পক্ষেরই রাজপুত মরুক না কেন, তাতেই ইসলামের লাভ।[101] এই হল নির্ভেজাল মুসলীম মানসিকতা। কাজেই দুর্ভিক্ষে হিন্দু মরলে কোন মুসলমানেরই বিন্দুমাত্র দুঃখিত হবার কোন কারণ থাকতে পারে না।

যাই হোক, মোগল আমলে প্রায়ই ভয়াবহ আকাল হত। ১৫৭৩ থেকে ১৫৯৫ সালের মধ্যে পাঁচবার আকাল হয় এবং ১৫৯৫ সালের আকাল তিন বছর ধরে চলতে থাকে। ১৬১৪ থেকে ১৬৬০ সালের মধ্যে মোট ১৩ বার আকাল হয়।[102] শাহজাহানের আমলে ১৬৩০-৩১ সালে যে আকাল হয়, তা ছিল সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ। সমস্ত দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে আকাল ছড়িয়ে পড়ে। এই আকাল সম্বন্ধে আবদুল হামিদ লাহোরী তার 'বাদশানামা'য় লিখছেন, "The inhabitants of these two countries (Deccan and Gujarat) were reduced to direst extremity. Life was offered for a loaf, but none would buy; rank was to be sold for a cake, but none cared for it,........For a long time dog's flesh was sold for goat's flesh and the pounded bones of the dead were mixed with flour and sold. ....Destitution at length reached such a pitch that men began to devour each other and the flesh of a son was preferred to his love."[103] —অর্থাৎ, "দাক্ষিণাত্য ও গুজরাট, এই দুই প্রদেশের মানুষের অবস্থা খুবই শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছিল। লোকেরা একখণ্ড রুটির জন্য সারা জীবনের দাসত্ব করতে রাজী ছিল, কিন্তু ক্রেতা ছিল

---

(101) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 132. (102) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 735. (103) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, VII, 24.

না। এক টুকরো পিষ্টকের বদলে এক দল মানুষ কেনা যেত, কিন্তু সেই সুযোগ নেবার লোক ছিল না। অনেক দিন ধরে পাঁঠার মাংস বলে কুকুরের মাংস বিক্রি হল, হাড়ের গুঁড়ো ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রি হল। ক্রমে দুর্দশা এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে মানুষ মানুষ খেতে শুরু করল। বাপ-মার কাছে সন্তানের স্নেহ-ভালবাসা থেকে তার শরীরের মাংসই বেশী প্রিয় হয়ে উঠল।”

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, শাহজাহানের রাজত্বকাল কেমন স্বর্ণযুগ ছিল। ডঃ শ্রীবাস্তব লিখছেন,"In spite of recurring famines the Mughal Government did not take adequate steps to provide relief."(102)—অর্থাৎ, “ঘুরে ফিরে বার বার দুর্ভিক্ষ হওয়া সত্ত্বেও মোগল সরকারের তরফ থেকে ত্রাণের কোন পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়া হত না।”

আমাদের ঐতিহাসিকরা লেখেন,"devastation of warfare and failure of annual rains"(102) ইত্যাদি কারণে দুর্ভিক্ষ হত। যুদ্ধ হবে দু পক্ষের সামরিক বাহিনীর মধ্যে, আর চাষ করবে অসামরিক চাষীরা। তাহলে যুদ্ধের জন্য আকাল হবে কেন? তাই এখানে'devastation of warfare'বলতে বুঝতে হবে সেনাবাহিনী এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পাইকারী দরে হিন্দু প্রজা হত্যা। এমন হত যে, গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। লক্ষ লক্ষ হিন্দু কাটা পড়ত। ফলে চাষ করবে কে? লোকের অভাবে জমি খালি পড়ে থাকত, আকাল হত। কাজেই মোগল যুগ কেমন স্বর্ণযুগ ছিল তা বুঝতে বাকী থাকে না। বিশেষ করে হিন্দুর কাছে এই মোগলযুগ কেমন ছিল শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় তা বললেই ভাল হবে। মুসলমান আমলে হিন্দুর করুণ অবস্থা বর্ণনা করতে তিনি লিখছেন,"So far as the Hindus were concerned, there was no improvement either in their material and moral conditions or in their relations with Muslims."(104)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আমাদের স্কুল ও কলেজগুলোতে মধ্যযুগীয় বা মুসলীম পরাধীনতার যুগের যে ভারতীয় ইতিহাস পড়ানো হয় তা জালিয়াতি ও মিথ্যাচারে ভরা। তাই উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে

---

(104) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, xi.

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখছেন,"It is very sad that the spirit of perverting history to suit political views is no longer confined to the politicians, but has difinitely spread even among the professional historians. ....A history written under the auspices of the Indian National Congress sought to repudiate the charge that the Muslim rulers broke Hindu temples, and they were the most tolerant in matters of religion."(105)—অর্থাৎ, "এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসারে ইতিহাসকে বিকৃত করার কাজ আজ শুধু রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, আজ এটা অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে তথাকথিত ঐতিহাসিকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে।.....ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রভাবে যে সব ইতিহাস লেখা হচ্ছে তার মূল দিক্‌নির্দেশই হল, মুসলমান শাসকরা সবাই ধর্মের ব্যাপারে উদার ছিল দেখাতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে হিন্দু মন্দির ভাঙার অভিযোগকে নিন্দা করতে হবে না।"

কেমন করে এবং কিভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করার এই ধারা বর্তমান চরম রূপ পায়, সে ব্যাপারে তিনি লিখছেন, "But the climax was reached by politician-cum-historian Lala Lajpat Rai, when he asserted that the Hindus and Muslims have coalesced into an Indian people very much in the same way as Angles, Saxons, Jutes, Danes and Normans formed the English people of today (Young India, p-73-5). His further assertion that,"The Muslim rule in India was not a foreign rule" has become the off-repeated slogan of a certain political party."(105)—অর্থাৎ, "ইতিহাসকে বিকৃত করার এই ধারা চরমতম পর্যায়ে পৌঁছাল যখন রাজনীতিক তথা ঐতিহাসিক লালা লাজপত রায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে, মধ্যযুগে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ সম্পূর্ণভাবে মিলেমিশে এক ভারতীয় জাতি হয়ে উঠেছিল। যেমন করে ইংল্যাণ্ডে অ্যাঙ্গলো স্যাক্সন, জুট, ডেন ও নর্মানরা মিলেমিশে এক ইংলিশ জাতি

(105) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, xii-xiii.

হয়ে উঠেছিল। তাঁর আর একটি সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, "ভারতের মুসলমান শাসনের আমল বিদেশীদের দ্বারা শাসিত পরাধীনতার যুগ ছিল না।" এই সিদ্ধান্ত বর্তমানে বিশেষ একটা রাজনৈতিক দলের স্লোগানে পরিণত হয়েছে।"

দুরাত্মা ঔরঙজেব যে কাশী ও মথুরার মন্দির সহ বহু হাজার হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছে বা মসজিদে রূপান্তরিত করেছে, তার চেয়ে জাজ্বল্যমান সত্য আর কিছু হতে পারে না। তার এই সব দানবীয় কাজকর্ম সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকরাও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে গিয়েছেন। সুলতান মামুদ থেকে শুরু করে ঔরঙজেব পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান আক্রমণকারীই হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছে এবং মুসলমান ঐতিহাসিকরা এই সব বর্বরোচিত কাজকে অত্যন্ত উল্লাসের সঙ্গে বর্ণনা করে গিয়েছেন।

এই মন্দির ভাঙার কাজে দস্যু ঔরঙজেব যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন তা আর কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আজকের সেকুলারপন্থী ঐতিহাসিকের দল বলে চলেছেন যে, ঔরঙজেব হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন কিনা তা বিতর্কের বিষয় এবং প্রমাণ সাপেক্ষ। তাই শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন,"If temple breaking policy of Aurangzeb is a disputed piont, is there a single fact in the whole recorded history of mankind which may be taken as undisputed?"(105)—অর্থাৎ, "ঔরঙজেবের মন্দির ধ্বংস করার নীতি যদি একটি বিতর্কিত বিষয় হয় তবে আজকের মানব ইতিহাসে এমন একটাও বিষয় পাওয়া যাবে কি যাকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে বলা যেতে পারে?"

অথচ ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক মুসলমান লিপিকার সাকি মুস্তাইদ খাঁ লিখছেন যে, ১০৭৯ হিজরীর ১৭ জিলকদ (১৮ই এপ্রিল, ১৬৬৯ খ্রীঃ) সম্রাট ঔরঙজেবের কাছে খবর পৌছালো যে, থাট্টা, মুলতান ও বারাণসীর এবং বিশেষ করে বারাণসীর মূর্খ ব্রাহ্মণরা তাদের মোটা মোটা ছেঁদো গ্রন্থ থেকে কি সব জংলী তত্ত্ব ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে চলেছে। কাফের হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু মুসলমান ছাত্রও সেখানে ঐ সব ছাই-ভস্ম শিখতে যাচ্ছে। এমনকি, বহু দূর দূর দেশ থেকেও বহু ছাত্র ঐসব ডাকিনী বিদ্যা শিখতে বারাণসীতে উপস্থিত হচ্ছে।

এই সংবাদ শোনা মাত্র সম্রাট ঔরঙজেব, ''The 'Director of the Faith' consequently issued orders to all the governors of provinces to destroy with a willing hand the schools and temples of the infidels; and they were strictly enjoined to put an entire stop to the teaching and practising of idolatrous forms of worship. On the 15th of Rabi-ul-Akhir it was reported to his religious Majesty, leader of the unitarians that, in obedience to order, the Government officers had destroyed the temple of Bishinath at Benares.''(106)—অর্থাৎ, "সেই অনুসারে ধর্মের দিক্‌নির্দেশকারী (সম্রাট) এক হুকুম জারি করলেন। ঐ সমস্ত প্রদেশের শাসনকর্তাদের আদেশ দেওয়া হল তাঁরা যেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে কাফেরদের মন্দির ও বিদ্যালয়সমূহকে ধ্বংস করেন। এই মর্মে তাঁদের কঠোর নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা যেন মূর্তি পূজার রেওয়াজ ও সেই সংক্রান্ত শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে চিরকালের মত স্তব্ধ করে দেন। পরবর্তী রবিউল-আখির মাসের ১৫ তারিখে একেশ্বরবাদীদের নেতা ও ধর্মপ্রাণ সম্রাটের কাছে খবর পৌছালো যে, সম্রাটের আজ্ঞানুসারে সরকারী কর্তারা বেনারসের বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করেছে।"

মুস্তাইদ খাঁ তারপর লিখছেন, ''In the month of Ramazan, 1018 A.H. (December, 1669), in the thirteenth year of the reign, the justice loving monarch, the constant enemy of the tyrants, commanded the destruction of the Hindu temple of Mathura or Mathra, known by the name of Dehra Kesu Rai, and soon that stronghold of falsehood was levelled with the ground. On the same spot was laid, at great expense, the foundation of a vast mosque.''(106)—অর্থাৎ, "১০৮০ হিজরীর রমজান মাসে (ডিসেম্বর, ১৬৬৯ খ্রীঃ), সম্রাটের রাজত্বকালের ত্রয়োদশ বছরে, অত্যাচারীদের (অর্থাৎ হিন্দুদের) অবিচল শত্রু ও ন্যায় বিচারের অনুরাগী সম্রাট (ঔরঙজেব) 'ডেরা-কেসু-রায়' নামে পরিচিত মথুরার হিন্দু মন্দিরটি ধ্বংস করতে আদেশ দিলেন। অনতিবিলম্বে মেকি ধর্মের সেই সুদৃঢ়

(106) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, VII, 184.

ঘাঁটি মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হল। ঠিক সেই জায়গাতেই বহু টাকা ব্যয় করে বিশাল এক মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হল।"

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, আজও মথুরায় গেলে দেখা যাবে যে সাবেক মন্দিরকে ধ্বংস বা ধূলিসাৎ করা হয়নি, শুধু তাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে মাত্র। ঠিক তেমনি পূর্ববর্তী বিবরণে কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আজও কাশীতে গেলে দেখা যাবে যে, ধ্বংস করার নামে তাকে শুধু মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই সব ঘটনা ও তার বিবরণ থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, এই সব বিবরণে যেখানেই মন্দির ধ্বংস করার কথা আছে সে সমস্ত ক্ষেত্রেই মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তর করা বুঝতে হবে।

সাকি মুস্তাইদ খাঁর বিবরণ অনুসারে বুন্দেলখণ্ডের রাজা নরসিংহ দেও যুবরাজ সেলিমকে সম্রাট জাহাঙ্গীর হতে নানাভাবে সাহায্য করেন। এর পুরস্কার হিসাবেই তিনি মথুরায় মন্দির নির্মাণ করার অনুমতি লাভ করেন এবং প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ঐ বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন। ঔরঙজেবের আদেশে সেই মন্দির ভেঙে সেখানে মসজিদ তৈরি করা হয়।

এই সংবাদে উল্লসিত মুস্তাইদ খাঁ লিখছেন, "Glory to the God, who has given us the faith of Islam, that, in this reign of the destroyer of false gods, an undertaking so difficult of accomplishment has been brought to a successful termination! This vigorous support given to the true faith was a severe blow to the arrogance of the Rajas and, like idols, they turned their face awe struck to the wall."(106)—অর্থাৎ, "ইনসাল্লা। ভাগ্যগুণে আমরা ইসলামকে দ্বীন (ধর্ম) হিসাবে পেয়েছি। যে কার্য সমাধা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ছিল, মেকি দেবদেবীর উপাসনার ধ্বংসকারী এই সম্রাটের রাজত্বে তাও সম্ভব হল। সত্যধর্মের প্রতি (সম্রাটের) এই বিপুল সমর্থন উদ্ধত হিন্দু রাজাদের চরম আঘাত হানল। পুতুল দেবতাদের মত তারাও তাদের ভয়ার্ত মুখ দেওয়ালের দিকে ফিরিয়ে রাখল।"

মন্দির তো ভাঙা হল, কিন্তু মন্দিরের বিগ্রহদের কি করা হল? সে ব্যাপারে সাকি মুস্তাইদ খাঁ লিখছেন, "The richly jewelled

idols taken from the pagan temples were transferred to Agra and there placed beneath the steps leading to the Nawab Begum Sahib's mosque, in order that they might ever be pressed under foot by the true believers.''(107)—অর্থাৎ, "জংলী সেই সব মন্দির থেকে মূল্যবান রত্নখচিত যে সব বিগ্রহ পাওয়া গেল সেগুলোকে আগ্রায় নিয়ে আসা হল এবং সেখানে নবাব বেগম সাহেবার (অর্থাৎ জাহানারার) মসজিদের সিঁড়ির নীচে ফেলে রাখা হল, যাতে সত্য ধর্মে বিশ্বাসীরা (মসজিদে যাওয়া-আসার সময়) সেগুলোকে চিরকাল পায়ের তলায় মাড়িয়ে যেতে পারে।"

সাকি মুস্তাইদ খাঁ আরও লিখছেন, ''On the 24th Rabi-ul-akhir, Khan-Jahan Bahadur arrived from Jodhpur, bringing with him several cart loads of idols, taken from the Hindu temples that had been razed. His Majesty gave him the great praise. Most of these idols were adorned with precious stones, or made of gold, silver, brass, copper or stone; it was ordered that some of them should be cast away in the out offices and the remainder placed beneath the steps of the grand mosque, there to be trampled under foot.''(108)—অর্থাৎ, "রবিউল আখির মাসের ২৪ তারিখে খান জাহান বাহাদুর কয়েক গাড়ী হিন্দু বিগ্রহ নিয়ে যোধপুর থেকে ফিরল। সেখানকার অনেক মন্দির ভেঙে ওই সব বিগ্রহ সংগ্রহ করা হয়েছিল। তার এই কাজের জন্য মহামান্য সম্রাট তাকে খুবই প্রশংসা করলেন। সোনা, রূপা, পিতল, তামা বা পাথরের তৈরি এই সব বিগ্রহের বেশির ভাগই মহামূল্য রত্ন খচিত ছিল। সম্রাটের হুকুম হল, কিছু বিগ্রহ জঞ্জাল হিসাবে এখানে-সেখানে ফেলে রাখতে এবং বাদবাকীগুলোকে জাম-ই-মসজিদের সিঁড়ির নিচে ফেলে রাখতে, যাতে বিশ্বাসীরা মসজিদে যাতায়াতের পথে সেগুলোকে মাড়াতে পারে।" কথিত আছে যে, পরে পাথরের মূর্তিগুলোকে ভেঙে খোয়া করা হয় এবং সেই খোয়া দিয়ে জাম-ই-মসজিদের চাতাল মোজাইক করা হয়,

(107) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, VII, 185.
(108) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, VII, 187.

যাতে নামাজীরা ওই সব বিগ্রহকে মাড়িয়ে নামাজ করে আল্লার নাম রোশন করতে পারে।

"On the 12th Zil hijja, 1090 A.H. (6th January, 1680), Prince Muhammad Azam and Khan-Jahan Bahadur obtained permission to visit Udaipur. Ruhullah Khan and Yakkataj Khan also proceeded thither to effect the destruction of temples of the idolators. These edifices, situated in the vicinity of the Rana's palace, were among the wonders of the age, and had been erected by the infidels to the ruin of the souls and the loss of their wealth."(108)—অর্থাৎ, "১০৯০ হিজরীর ১২ই জিলহজ (৬ই জানুয়ারী, ১৬৮০ খ্রীঃ) যুবরাজ মহম্মদ আজম ও খানজাহান বাহাদুরকে উদয়পুরে যাবার অনুমতি দেওয়া হল। রুহুল্লা খাঁ এবং ইক্কাতাজ খাঁকে সঙ্গে করে তারা হিন্দু মন্দির ভাঙার জন্য সেখানে রওনা দিল। মহারানার প্রাসাদের কাছেই অবস্থিত সেই সব মন্দিরগুলো ছিল সেই যুগের বিস্ময়। কাফেররা গায়ের রক্ত জল করে, বহু অর্থব্যয়ে সেই সব মন্দির নির্মাণ করেছিল।"

কুড়িজন রাজপুত যুবক মন্দির রক্ষার্থে প্রাণ বিসর্জন দিতে সংকল্প করে। বর্বর মুসলমানদের সঙ্গে তারা পরম বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকে এবং বহু মুসলমান হতাহত করে অবশেষে প্রাণ দেয়। তারপর, "The temple was now clear and the pioneers destroyed the images."(109)—অর্থাৎ, "শেষে মন্দির মুক্ত হল, এবং অগ্রবর্তী লোকেরা (অর্থাৎ মুসলমানরা) মন্দিরের বিগ্রহ ধ্বংস করল।"

রাজপুতানায় ঔরঙ্গজেবের মন্দির ভাঙার তাণ্ডব বর্ণনা করে সাকি মুস্তাইদ খাঁ আরও লিখছেন, "On the 2nd of Muharram, 1091 A.H. (24th January, 1680), the king visited the tank of the udisagar, constructed by the Rana. His Majesty ordered all three of the Hindu temples to be levelled with the ground."(109)—অর্থাৎ, "১০৯১ হিজরীর ২রা মহরম (২৪শে জানুয়ারী, ১৬৮০ খ্রীঃ), সম্রাট মহারানার তৈরি উঁদিসাগর জলাধারে ভ্রমণ করতে গেলেন। মহামান্য সম্রাট

(109) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, VII, 188.

সরোবরের তীরে অবস্থিত তিনটি হিন্দু মন্দিরকেই ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হুকুম দিলেন।"

"On 7th Muharram, Hasan Ali Khan made his appearence with twenty camels taken from the Rana and stated that the temples situated near the palace and one hundred and twenty two more in the neighbouring districts, had been destroyed."(109)—অর্থাৎ, "৭ই মহরম হাসান আলি খাঁ ফিরে এল, সঙ্গে নিয়ে এল রানার কাছ থেকে কেড়ে আনা কুড়িটা উট। সে খবর দিল যে, রানার প্রাসাদের নিকটবর্তী মন্দিরগুলি সহ আশেপাশের অঞ্চলের আরও ১২২টা মন্দির তারা ধ্বংস করেছে।" এই কাজের জন্য সম্রাট হাসান আলিকে 'বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

"His Majesty proceeded to Chitor on the 1st of Safar. Temples to the number of sixty-three were demolished."(109) —অর্থাৎ, "সফর মাসের ১লা তারিখে মহামান্য সম্রাট (ঔরঙ্গজেব) চিতোর যাত্রা করলেন এবং সেখানে ৬৩টি মন্দির ভাঙা হল।"

"Abu Turab, who had been commissioned to effect the destruction of the idol temples of Amber, reported in person on the 24th Rajab that three score and six of these edifices had been levelled with the ground."(109)—অর্থাৎ, "আবু তুরাব-এর উপর অম্বরের মন্দির ভাঙার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। ২৪শে রজব সে নিজে এসে খবর দিল যে, সেখানে ৬৬টি মন্দির তারা ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।"

ঔরঙ্গজেবের মন্দির ভাঙার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক জে. এন. চৌধুরী লিখছেন, "Besides innumerable temples throughout the empire, even the famous Hindu temples of Visvanatha of Banaras, of Keshar Deb at Mathura and Somnath at Patan were destroyed (by Aurangzeb)."—অর্থাৎ, "সমস্ত সাম্রাজ্যের অসংখ্য মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে ঔরঙজেব বেনারসের বিখ্যাত বিশ্বনাথ মন্দির, মথুরার বিখ্যাত কেশর দেব মন্দির এবং পাটনের বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করেন।"(110)

---

(110) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 235

এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক জি. এস. সরদেশাই লিখছেন, ''On 9th April, 1669 he (Aurangzeb) issued general orders for demolishing all Hindu schools and temples and putting down all Hindu religion's teachings and practices. All Hindu fairs and ceremonies were forcibly banned. The famous temple of Kasi Visvesvar was pulled down in 1669 and that of Keshab Rai in 1670, the news of which flashed like lightning throughout India. New grand mosques arose on the sites of both the temples which stand to this day, visible for miles as one travels to Benaras and Mathura.''(111)—অর্থাৎ, "১৬৬৯ সালের ৯ই এপ্রিল ঔরঙজেব দেশের সমস্ত হিন্দু শিক্ষায়তন ও হিন্দু মন্দির ধ্বংস করার এবং হিন্দুদের সবরকম ধর্মচর্চা ও শাস্ত্রচর্চাকে সমূলে বিনাশ করার এক ব্যাপক হুকুমনামা জারি করলেন। হিন্দুদের সমস্ত রকম মেলা এবং উৎসবাদিও নিষিদ্ধ ঘোষিত হল। ১৬৬৯ সালে বিখ্যাত কাশী বিশ্বনাথ মন্দির এবং ১৬৭০ সালে (মথুরার) বিখ্যাত কেশব রায় মন্দির ধ্বংস করা হল, এই সংবাদ বিদ্যুৎবেগে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। উল্লিখিত উভয় মন্দিরের জায়গাতেই বিশাল দুই মসজিদ খাড়া করা হল যা আজও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং যে কেউ কাশী বা মথুরা ভ্রমণে গেলে অনেক দূর থেকেই তা দেখতে পাবেন।"

ঐতিহাসিক এ. কে. মজুমদার এ ব্যাপারে লিখছেন, ''As clouds pour water upon the earth, so did Aurangzeb pour his barbarism over the land....Jodhpur fell and was pillaged; and all the great towns in the plains of Mairta, Didwana and Rohit shared a similar fate. The emblems of (Hindu) religion were trampled under foot, temples thrown down and mosques erected on their sites.''(112)—অর্থাৎ, "মেঘ যেমন পৃথিবীতে জল বর্ষণ করে, ঔরঙজেব সেই রকম সমস্ত দেশ জুড়ে তাঁর বর্বরতা

(111) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 265.
(112) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 349.

বর্ষণ করলেন....যোধপুরের পতন হল এবং তাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হল। মৈর্ত, দিদোয়ানা ও রোহিত ভূখণ্ডে যত শহর ছিল সকলেরই ওই একই হাল হল। হিন্দুর সমস্ত রকম পবিত্র ধর্মীয় প্রতীক পায়ে দলিত হল, হিন্দুর মন্দির ভেঙে ধূলিসাৎ করা হল এবং সেই জায়গায় মসজিদ খাড়া করা হল।”

উপরিউক্ত ঘটনাবলী থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সমস্ত দেশ জুড়ে হিন্দু মন্দির ভাঙার কি তাণ্ডব ঔরঙজেব চালিয়েছিল। তার সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক বা লিপিকারেরা অত্যন্ত উল্লসিত ভাষায় ঔরঙজেবের সেই সব দানবীয় ও ঘৃণিত কাজকর্ম নথিভুক্ত করে রেখে গেছেন। তবু যখন বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা চালিত হয়ে কিছু কিছু হিন্দু এই মত ব্যক্ত করেন যে, ঔরঙজেব হিন্দু মন্দির ভেঙেছেন কি না তা প্রমাণ সাপেক্ষ, তখন সেই সমস্ত ব্যক্তিকে ধিক্কার জানাবার মত ভাষা খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে।

অনেক সময় অনেক মূর্খ হিন্দু মুসলমানদের এই পরামর্শ দেন, “তোমরা নিষ্ঠাবান মুসলমান হও।” তাঁরা মনে করেন যে, কোন মুসলমান নিষ্ঠাবান মুসলমান হলে তার চারিত্রিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটবে। সে ভাই ভাই বলে হিন্দুদের জড়িয়ে ধরবে এবং কোলাকুলি করবে। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ঐ সব মূর্খ হিন্দুর জানা নেই যে, কোন মুসলমান নিষ্ঠাবান হলে তার নিজের কি ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হবে। কোন মুসলমান নিষ্ঠাবান মুসলমান হলে সে ওরঙ্গজেবের মতই একটি দানবে পরিণত হবে। যদি তার ক্ষমতা থাকে তবে মুহূর্তের মধ্যে সে দুনিয়াকে কাফেরশূন্য করবে। ইসলাম বহির্ভূত সমস্ত বই পুস্তক জ্বালিয়ে দেবে। ইসলাম বহির্ভূত সমস্ত উপাসনালয় ধ্বংস করবে এবং সমস্ত পৃথিবীতে আল্লার রাজত্ব কায়েম করবে। সেই আল্লার রাজত্ব হবে পরিপূর্ণ এক মূর্খের রাজত্ব। সেখানে আল্লার কোরান ও হাদিস ছাড়া আর সমস্ত জ্ঞানচর্চা নিষিদ্ধ হবে। চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য নিষিদ্ধ হবে। সঙ্গীত, নাটক, সিনেমা, টেলিভিশন ইত্যাদি সমস্ত রকম আমোদ-প্রমোদ ও শিল্পকলা নিষিদ্ধ হবে। থাকবে শুধু নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ। সমস্ত পৃথিবীতে বিরাজ করবে নিস্তব্ধ এক শ্মশানের শান্তি।

রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে আমাদের দেশের এক ধরনের ব্যক্তিরা কি নগ্ন ভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করে চলেছেন, একটা উদাহরণ দিলে তা বুঝতে সুবিধা হবে। বিগত ১৯৮৯ সালে পশ্চিমবঙ্গর মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ একটা বিজ্ঞপ্তি জারি করে।(113) পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কাছে ঐ বিজ্ঞপ্তি পাঠনো হয় এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিভাবে ইতিহাসের বই লিখতে হবে, সে ব্যাপারে তাতে খোলাখুলি নির্দেশ দেওয়া হয়। ঐ নির্দেশাবলীর প্রথম কথাই হল-- ভারতের মুসলমান আমলের সময়কে কোন রকম বিরূপ সমালোচনা করা যাবে না। মুসলমান শাসকরা যে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছে তা উল্লেখ করা যাবে না।

সেই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অনুমোদিত মাধ্যমিক স্কুলগুলোর প্রধান শিক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ যে সব ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তককে নবম শ্রেণীর পাঠযোগ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে সেই বইগুলোর মধ্যযুগের ইতিহাসের অধ্যায়ে কিছু কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌রাই এই পরিবর্তনগুলো সুপারিশ করেছেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।

"এই কারণে নবম শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তগুলির লেখক ও প্রকাশকদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে তাঁরা যেন তাঁদের বইয়ের ভবিষ্যৎ সংস্করণগুলিতে, নিচে যেমন দেখানো হয়েছে সেইভাবে, অশুদ্ধ অংশগুলোকে শুদ্ধ করে প্রকাশ করেন। আর যে সব বই ইতিমধ্যে ছাপা হয়ে গিয়েছে, তাতে নিম্নলিখিত 'অশুদ্ধ-শুদ্ধ' তালিকাটি জুড়ে দেন এবং সেই রকম একখানা বই যেন ৭৪ নং রফি আমেদ কিদোয়াই রোড, কলিকাতা- ১৬স্থিত পর্ষৎ অফিসে জমা দেন।"

এই মূল বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে 'অশুদ্ধ-শুদ্ধ' তালিকা সংক্রান্ত দুটো পৃথক পৃষ্ঠা জুড়ে সব স্কুলে পাঠানো হয়। সেই 'অশুদ্ধ-শুদ্ধ' তালিকায় কি ছিল তা নিচে দেওয়া গেল।

(113) Circular No. Syl/89/1; Dated. 28.4.1989.

পুস্তকের নাম ঃ ভারত কথা
লেখকের নাম ঃ বর্ধমান শিক্ষাসমিতি, শিক্ষা সংগঠন
প্রকাশকের নাম ঃ সুখময় দাস

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃঃ ১৪০ - সিন্ধুদেশে আরবরা হিন্দুদের কাফের বলে মনে করত না। তারা গোহত্যা বন্ধ করেছিল।	'তারা গোহত্যা বন্ধ করেছিল' অংশটি বাদ দিতে হবে।
পৃঃ১৪১ - চতুর্থতঃ, বলপূর্বক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করাও একপ্রকার আক্রমণ। পঞ্চমতঃ বলপূর্বক হিন্দু রমণীদের বিবাহ করা ও তাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করাও উলেমাদের দ্বারা মৌলবাদের প্রসারের আর এক দিক মাত্র।	যদিও 'চতুর্থতঃ' শব্দের পর থেকেই অশুদ্ধতা শুরু হয়েছে, তবে 'দ্বিতীয়তঃ' থেকে 'উলেমা' পর্যন্ত পুরো অংশটাই বাদ দিতে হবে।
পৃঃ ১৪১ - যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী মুতাজিলা দর্শন অন্তর্হিত হল। এক দিকে কোরান ও হাদিসকে ভিত্তি করে...........	'এক দিকে কোরান ও হাদিসকে ....' পুরো অংশটা বাদ দিতে হবে।

পুস্তকের নাম ঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস
লেখকের নাম ঃ ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
প্রকাশকের নাম ঃ চক্রবর্তী এন্ড সন্স

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃঃ ৮৯ - সুলতান মামুদ ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন, ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম ও বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ করেছিলেন।	সুলতান মামুদ ব্যাপক হত্যা, ধ্বংস ও লুণ্ঠন করেছিল ঠিকই, কিন্তু বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ করেছিল তার কোন প্রমাণ নেই।
পৃঃ ৮৯ - সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করে সে প্রায় ২ কোটি দিরহাম (স্বর্ণমুদ্রা) মূল্যের মূল্যবান	'সোমনাথের শিবলিঙ্গ....সিঁড়ির মত ব্যবহার করেছিল' অংশটা বাদ দিতে হবে।

জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছিল। সোমনাথের শিবলিঙ্গ গজনীতে নিয়ে গিয়ে সেখানকার মসজিদে তা সিঁড়ির মত ব্যবহার করেছিল।	
পৃঃ ১১২ - মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের ব্যাপারটা খুবই স্পর্শকাতর বিষয় ছিল। অ-মুসলমানদের মৃত্যু অথবা ইসলাম, এই দুইয়ের মধ্যে একটা বেছে নিতে হত।	সমস্ত বিষয়টাই বাদ দিতে হবে।
পৃঃ ১১৩ - ইসলামী আইন অনুসারে অ-মুসলমানদের সামনে দুটো রাস্তা খোলা ছিল, হয় ইসলাম নয় মৃত্যু। একমাত্র হানিফি মতানুসারেই অ-মুসলমানদের জিজিয়া দিয়ে প্রাণরক্ষা করার ব্যবস্থা ছিল।	বিষয়টা এইভাবে লিখতে হবে, আলাউদ্দিনকে জিজিয়া কর দিয়ে সব হিন্দুই সাধারণ জীবন যাপন করতে পারত।
পৃঃ ১১৩ - মেহমুদ ইসলামে প্রবল বিশ্বাসী ছিলেন যার মূল কথা হল হয় ইসলাম নয় মৃত্যু।	পুরো বিষয়টা বাদ দিতে হবে।

পুস্তকের নামঃ ভারতের ইতিহাস
লেখকের নামঃ শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশকের নামঃ নর্মদা পাবলিশার্স

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃঃ ১৮১ - মুসলমানরা যাতে দেখতে না পায় সেইজন্য হিন্দু রমণীদের ঘরে বন্দী করে রাখা হত।	পুরোটা বাদ দিতে হবে।

পুস্তকের নামঃ ইতিহাসের কাহিনী
লেখকের নামঃ নলিনীভূষণ দাসগুপ্ত
প্রকাশকের নামঃ বি. বি. কুমার

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃঃ ১৩২ - বিখ্যাত ঐতিহাসিক টড'-এর মতে আলাউদ্দিনের চিতোর অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল রানা রতন সিংহের সুন্দরী পত্নী পদ্মিনীকে হস্তগত করা।	পুরোটা বাদ দিতে হবে।
পৃঃ ১৫৪ - ইসলামী আইন অনুসারে অ-মুসলমানদের সামনে তিনটি রাস্তা খোলা ছিল। হয় মুসলমান হও, নতুবা জিজিয়া দাও অথবা মৃত্যু বেছে নাও। যে কোন একটা ইসলাম শাসিত-রাজ্যে যে কোন অ-মুসলমানকে এই তিনটির মধ্যে যে কোন একটা বেছে নিতে হত।	পুরোটা বাদ দিতে হবে।
পৃঃ ১৬১ - প্রথমদিকের মুসলমান শাসকরা বলপূর্বক হিন্দুদের মুসলমান করে ইসলামের সাম্রাজ্য বাড়াতে খুবই তৎপর ছিল।	পুরোটা বাদ দিতে হবে।

পুস্তকের নাম ঃ ভারতের ইতিহাস
লেখকের নাম ঃ পি. মাইতি
প্রকাশকের নাম ঃ শ্রীধর প্রকাশনী

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃঃ ১১৭ - কথিত আছে যে, আলাউদ্দিন রানা রতন সিংহের সুন্দরী পত্নী পদ্মিনীকে লাভ করতে	পুরোটা বাদ দিতে হবে।

মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন।	
পৃঃ ১৩৯ - তখনকার দিনে মহিলাদের পর্দা রক্ষা করার মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ আছে মনে করা হত। এই কারণে অভিজাত মুসলমানদের অনুসরণে অভিজাত হিন্দু রমণীদের মধ্যেও পর্দা চালু হয়। অনেকের মতে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই হিন্দু সমাজে পর্দার প্রচলন শুরু হয়।	পুরোটা বাদ দিতে হবে।

পুস্তকের নাম ঃ স্বদেশ ও সভ্যতা
লেখকের নাম ঃ ডঃ পি. কে. বসু. ও এ. বি. ঘটক
প্রকাশকের নাম ঃ অভিনব প্রকাশন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃঃ ১২৬ - অনেকে মনে করেন যে, রানা রতন সিংহের সুন্দরী পত্নী পদ্মিনীকে হস্তগত করার জন্যই আলাউদ্দিন মেবার অভিযান করেন।	পুরোটা বাদ দিতে হবে।
পৃঃ ১৪৫ - এ ছাড়াও, ইসলাম অত্যন্ত অমানবিক ও নৃশংস উপায়ে নিজেকে ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। তাই তা ভারতীয় ও ইসলামী সংস্কৃতির মিলনের প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছিল।	পুরোটা বাদ দিতে হবে।

পুস্তকের নাম ঃ ভারতের ইতিহাস
লেখকের নাম ঃ এ. সি. রায়
প্রকাশকের নাম ঃ প্রান্তিক

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃঃ ১০২- এরূপ কথিত আছে যে, রানা রতন সিংহের সুন্দরী পত্নী পদ্মিনীকে লাভ করতেই আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন।	পুরোটা বাদ দিতে হবে।
পৃঃ ১৬৪ - ইসলামের প্রতি এটাই ছিল তাঁর প্রতিশ্রুতি এবং এই কারণেই তাঁকে মৌলবাদী হতে হয়েছিল।	পুরোটা বাদ দিতে হবে।

পুস্তকের নাম ঃ ভারত কথা
লেখকের নাম ঃ জি. ভট্টাচার্য
প্রকাশকের নাম ঃ বুলবুল প্রকাশন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃঃ ৪০ -মুসলমানরা ভারতীয়দের উপর তাদের ধর্মবিশ্বাস চাপিয়ে দিতে অকথ্য অত্যাচার ও অন্যান্য অমানবিক পন্থা গ্রহণ করত।	পুরোটা বাদ দিতে হবে।
পৃঃ ৪১ - ইসলামের মধ্যেকার উদার ও মানবিক দিকগুলো অত্যাচারিত হিন্দুদের মধ্যে আশা জাগাতো।	পুরো অনুচ্ছেদটা বাদ দিতে হবে। বদলে লিখতে হবে— ইসলামে জাতিভেদের কোন স্থান নেই। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অনুপ্রেরণা হিন্দুদের মধ্যে এক নব জাগরণের সূচনা করে। ফলে নীচ বর্ণের হিন্দুরা ইসলাম গ্রহণ করে।[114]

(114) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পুস্তকের নাম ঃ ভারত কাহিনী
লেখকের নাম ঃ জি. সি. রায়চৌধুরী
প্রকাশকের নাম ঃ এ. কে. সরকার এন্ড কোং

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃঃ ১৩০ - এই কারণেই সে হিন্দুকে মুসলমান করার নীতি গ্রহণ করে, যাতে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ানো যায়। যে সব হিন্দুরা তার এই নীতিকে অস্বীকার করত, সে নিজে অথবা তার সেনাপতিরা তাদের পাইকারী দরে হত্যা করত।	পুরো অনুচ্ছেদটাই বাদ দিতে হবে।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, এই সব সরকারী নির্দেশ বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের স্বার্থে অথবা ক্ষমতার গদীতে টিকে থাকার উদ্দেশ্যে, কি ভাবে ইতিহাসের সত্যতাকে গলা টিপে হত্যা করছে। আজ যে কেউ ইসলাম বা ভারতের মুসলীম শাসনের যুগ সম্পর্কে সত্য কথা বললেই তাকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। ইতিহাসকে বিকৃত করার অপরাধে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। অথচ হাস্যকর ব্যাপার হল এই যে, যাঁরা এই অভিযোগ আনছেন তাঁরা এতকাল তাঁদের ইচ্ছামত ইতিহাসকে বিকৃত করে এসেছেন এবং আজও তা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে করে চলেছেন।

এই সব ব্যক্তিরা নিজেদের পরিচয় দেন 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' বা 'সেকুলার' বলে। এই মেকী ধর্ম-নিরপেক্ষতার মূল উদ্দেশ্যই হলো ভোটের রাজনীতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোট জোগাড় করা। এই কারণে তারা যত রকম ভাবে পারা যায় ইসলামের গুণগান, মধ্যযুগের বর্বর মুসলমান শাসকদের গুণগান করে মুসলমান সম্প্রদায়ের তোষামোদ করে চলেছেন। ইসলামের রক্তাক্ত তরবারিটাকে, রক্তাক্ত থাবাটাকে আড়াল করে চলেছেন।

এঁরা সর্বদাই ইসলামকে একটি মহান, উদার ও পরমত-সহিষ্ণু ধর্ম বলে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রচার করে বলেছেন ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি।

তবে সুখের কথা হল জনসাধারণকে আর ভুলিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। চোখের সামনে টিভির পর্দায় তাঁরা আফগানিস্তানের তালিবানদের কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করছেন। মুসলমান জঙ্গীদের দ্বারা দিনের পর দিন কাশ্মীরে নিরপরাধ হিন্দুহত্যার দৃশ্য তাঁরা প্রত্যক্ষ করছেন। কাজেই ইসলাম যে শান্তি নয়, এটা তাঁরা খুব ভাল করেই বুঝতে পারছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই সব ধর্ম-নিরপেক্ষবাদী রাজনৈতিক নেতাদের কু-মৎলবও তাঁরা ধরে ফেলতে শুরু করেছেন। এই ধর্ম-নিরেপেক্ষবাদীদের মদতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গে যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সে ব্যাপারেও তাঁরা সচেতন হচ্ছেন। তাঁরা বুঝতে শিখেছেন যে, ইসলামের মত অমানবিক, নিষ্ঠুর ও নৃশংস, সাম্প্রদায়িক আর কোন তত্ত্ব এই পৃথিবীতে নেই।

কাজেই সেদিনের আর বেশি দেরী নেই, যেদিন এই সব বস্তাপচা বিকৃত ইতিহাস, মিথ্যার ইতিহাস, আবর্জনার মতই পরিত্যক্ত হবে। মানুষ সত্য ইতিহাস জানতে চাইবে। সত্য ইতিহাস লেখা হবে, পঠন-পাঠন হবে। সত্য ইতিহাস জানার জন্য নতুন উদ্যমে গবেষণা শুরু হবে।

আরও একটা সুখের কথা হল, সত্যকে আর চাপা দিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ইতিহাস তার নিজের কথা নিজেই বলতে শুরু করেছে এবং আগ্রা থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে ফতেপুর-সিক্রিতে তার শুভ সূচনা হয়েছে।

ফতেপুর সিক্রির ইতিকথা

আমাদের ঐতিহাসিকরা এতদিন প্রচার করে এসেছেন যে, আজকের ফতেপুর সিক্রি এককালে জনমানবহীন এক ঘন জঙ্গল ছিল। সেখানে বাঘ, সিংহ ইত্যাদি হিংস্র পশু বিচরণ করত। সেই বনের মধ্যে বাদশা আকবরের গুরু সেলিম চিস্তি কুটির তৈরি করে ১৫৩৭ সাল থেকে বসবাস করতে থাকেন।(115) এদিকে পুত্র সন্তান হয়ে অকালে মারা যাবার কারণে আকবরের মনে খুবই দুঃখ ছিল। সেলিম চিস্তির অনুগ্রহে দুই ছেলে জন্মাবার পর ফতেপুর সিক্রি জায়গাটা আকবরের কাছে খুবই পয়মন্ত বলে মনে হল। তাই তিনি প্রাসাদ, দুর্গ, অট্টালিকা নির্মাণ করে সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করার এক ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করলেন এবং এভাবেই বর্তমান ফতেপুর সিক্রি নগরীর পত্তন হল। সেখানে জনবসতির সূত্রপাত হল।

নিজামুদ্দিন আহম্মদ রচিত 'তাবাকৎ-ই-আকবরী' বলছে, "সম্রাটের বেশ কয়েকটি পুত্রসন্তান জন্মেছিল, কিন্তু তার একটাও বাঁচল না। আগ্রা থেকে ১২ ক্রোশ দূরে সিক্রিতে সেলিম চিস্তি বাস করতেন এবং তিনি আকবরকে পুত্রসন্তানের আশ্বাস দিলে সম্রাট খুবই খুশি হলেন। ....যখন সম্রাটের পত্নীদের মধ্যে একজন গর্ভবতী হল, তখন সম্রাট তাকে সিক্রিতে পাঠিয়ে দিলেন। ....তখনই সম্রাট ঐ জায়গার নাম সিক্রির বদলে ফতেপুর রাখলেন এবং সেখানে একটি বাজার বসালেন ও একটি স্নানাগার নির্মাণ করলেন।(116)

যথাকালে ৯৭৭ হিজরীর ১৮ই রবিউল আওয়াল (৩০শে আগস্ট, ১৫৬৯ খ্রীঃ) সেখানে সেলিম চিস্তির কুটিরে শেখ সেলিম মির্জার (পরবর্তী কালে জাহাঙ্গীর) জন্ম হল। তারপর,"The Emperor made Fathepur a royal abode, raised a stone

---

(115) V. A. Smith, ibid, 105. (116) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, V, 333

fortification round it and built a splendid edifice, so that it became a great city."[117] অর্থাৎ ফতেপুর-সিক্রির দুর্গ, প্রাসাদ, অট্টালিকা, সব কিছুরই নির্মাতা বাদশা আকবর। ঐতিহাসিকদের মতে ১৫৬৯ সালে শেখ সেলিম মির্জার জন্ম হয় এবং তার দুবছর পরে, ১৫৭১ সালে আকবর তার রাজধানী আগ্রা থেকে সিক্রিতে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করেন।

ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, সম্রাট আকবর ১৫৭১ সালে অখ্যাত একটি গ্রাম সিক্রিকে বিশাল এক শহরে পরিণত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং গুজরাট জয় করার পর তার নাম পাল্টে ফতেহাবাদ রাখা হয়। ১৫৭১ সালেই নগর নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং ১৪ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে কাজ শেষ হয়।[115] ঐতিহাসিক স্মিথ আরও লিখছেন যে, ১৫৭৫-৭৬ সালে গুজরাট বিজয়ের স্মারক হিসাবে বুলন্দ দরওয়াজা নির্মাণ করা হয়।[118] কিন্তু বুলন্দ দরওয়াজার গায়ে যে শিলালিপি অঙ্কিত আছে তা থেকে প্রমাণ হয় যে, ১৬০১ সালে আকবর দাক্ষিণাত্য অভিযান থেকে ফিরে এলে ঐ দরওয়াজা নির্মাণ করা হয়।

কিন্তু ভিনসেন্ট স্মিথের মতে ১৫৬৯ সালে আকবরের সিক্রি যাওয়া শুরু হয় এবং ১৫৮৫ সালে শরৎকালে জলাভাবের জন্য সিক্রি পরিত্যক্ত হয়।[118] কাজেই ১৬০১ সালে বুলন্দ দরওয়াজা তৈরি হতে পারে না। অপর দিকে আমাদের ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস যে, ১৬০৪ সালে ফতেপুর সিক্রি চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত হয় এবং বুলন্দ দরওয়াজা ১৬০১ সালেই তৈরি করা হয়।[119]

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বুলন্দ দরওয়াজার নির্মাণকালের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ঠিক তেমনি খোদ ফতেপুর সিক্রি নগরীর নির্মাণকাল নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। আমাদের ঐতিহাসিকদের মতে, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাজ হয়, ''The work was pushed on with such phenomenal speed that, as if by magic, palaces, public buildings, mosques and tombs, gardens and baths, pavilions and water courses were called into being beneath the barren sandstone ridge of Sikri''[119] —অর্থাৎ, "এত

(117) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, V, 334. (118) V. A. Smith, ibid, 107. (119) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 760

দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে গেল যে, প্রাসাদ, সরকারী কার্যালয়, মসজিদ, কবরখানা, বাগান, স্নানাগার এবং সিক্রির কঠিন লাল পাথরের নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া জলপ্রবাহের নালা, সব যেন জাদুমন্ত্রবলে তৈরি হয়ে গেল।" জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন, "In course of fourteen to fifteen years that hill full of wild beasts became a city containing all kinds of gardens and buildings, lofty edifices and pleasant places attractive to the heart."(119)

—অর্থাৎ, "মাত্র ১৪ কি ১৫ বছরের মধ্যে এক কালের বন্য জীবজন্তুতে পূর্ণ সিক্রি, রমণীয় বাগান, অট্টালিকা, সুদৃশ্য প্রাসাদ এবং মনোহরণকারী স্থানসমূহে পূর্ণ এক মনোরম নগরীতে পরিণত হল।" আগেই বলা হয়েছে যে, আমাদের ঐতিহাসিকদের মতে সফল দাক্ষিণাত্য অভিযানের স্মারক হিসাবে ১৬০১ খ্রীস্টাব্দে বুলন্দ দরওয়াজা নির্মিত হয়। তাঁদের মতে, "The southern entrance to the Jam-i-Masjid at Fathepur sikri was considered to be a suitable position, and the original entrance was replaced by the construction of a massive portal. This was known as the Buland Darwaja."(120) —অর্থাৎ, "জাম-ই-মসজিদের কাছে, ফতেপুর সিক্রির দক্ষিণের প্রবেশ-পথকেই উপযুক্ত স্থান হিসাবে নির্বাচিত করা হল এবং সাবেক ফটক ভেঙে সেখানে তৈরি করা হল বিশাল এক ফটক। এরই নাম বুলন্দ দরওয়াজা।" এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, আজ যেখানে বুলন্দ দরওয়াজা দাঁড়িয়ে আছে, আগে সেখানে অন্য এক ফটক ছিল এবং সেই ফটক ভেঙে সেখানে বুলন্দ দরওয়াজা নির্মাণ করা হয়। সাধারণ বুদ্ধি বলে যে, সেই ফটক নিশ্চয়ই আকবরের অনেক আগের তৈরি ছিল, কারণ আকবর সেই ফটক তৈরি করলে সদ্য নির্মিত সেই ফটক ভাঙা হত না।

এবার ফতেপুর সিক্রি সম্বন্ধে আর এক দল ঐতিহাসিক কি বলেন তা শোনা যেতে পারে। তাঁদের মতে ফতেপুর সিক্রি বা সিক্রি অতি প্রাচীন কাল থেকেই এক বর্ধিষ্ণু জায়গা ছিল এবং বুলন্দ দরওয়াজা-শোভিত যে দুর্গ আকবর তৈরি করেছেন বলে আজ বলা হচ্ছে, তাও

---

(120) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 763.

অনেক প্রাচীন। এককালে ঐ দুর্গ মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহের অধীনে ছিল এবং ঐ দুর্গের নিকটবর্তী প্রান্তরেই রানা সংগ্রাম সিংহের সাথে বাবরের যুদ্ধ হয়, যা ইতিহাসে খানুয়ার যুদ্ধ নামে খ্যাত। যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহ পরাজিত হলে ঐ দুর্গ মুসলমানরা দখল করে।

ইয়াহিয়া বিন আহম্মদের লেখা 'তারিখ-ই-মুবারকশাহী' বলছে যে, ১৪০৫ সালে ফতেপুরের অদূরে খিজির খাঁ ও ইকবাল খাঁর মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইকবাল খাঁ (মাল্লু) পরাজিত হলে খিজির খাঁ তাকে হত্যা করে এবং তার মাথা ফতেপুরে পাঠিয়ে দেয়।[121] কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আকবরের ১৫০/২০০ বছর আগেও ফতেপুরের অস্তিত্ব ছিল। উক্ত গ্রন্থে আরও বলা হচ্ছে, "Sikri, which is now known as Fathepur, was entrusted to Malik Khairud-din Tuhfa."[122]—অর্থাৎ, "পূর্বে যার নাম সিক্রি ছিল, তারই বর্তমান নাম ফতেপুর এবং মালিক খইরুদ্দিন তুফাকে এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হল।" কাজেই তখনকার ফতেপুরই যে আজকের ফতেপুর সিক্রি, তাও এই উক্তির মধ্য দিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বাবরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-বাবরী'তে খানুয়ার যুদ্ধের বর্ণনা আছে। ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দের ১১ই ফ্রেব্রুয়ারী বাবর আগ্রা ত্যাগ করে সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। সিক্রির কাছাকাছি পৌঁছে বাবর বিশাল এক দিঘির কাছে শিবির স্থাপন করেন যাতে পানীয় জলের কোন অভাব না হয়। "There being a large tank on our left. I encamped there, for the benefit of water."[123]—অর্থাৎ, "আমাদের বাঁ দিকে পড়ল বিশাল এক জলাধার এবং পানীয় জলের সুবিধার্থে আমি সেখানেই শিবির স্থাপন করতে আদেশ দিলাম।"

এই সময় বাবর আবদুল আজিজ ও মোল্লা আপাক-এর নেতৃত্বে প্রায় ১০০০ সৈন্যের একটি বাহিনীকে একটু এগিয়ে পরিস্থিতি অনুমান করার আদেশ দিলেন। সিক্রিকে পাশে রেখে আবদুল আজিজের বাহিনী প্রায় ৫ ক্রোশ দূরে কনওয়াহা নামক স্থানে পৌঁছালো—"he advanced as far as Kanwaha, which is five kos from

(121) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, IV, 40. (122) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, IV, 62. (123) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, IV, 268.

Sikri.''(124)—অর্থাৎ, "সে সিক্রি থেকে প্রায় ৫ ক্রোশ দূরে কনওয়াহা পর্যন্ত এগিয়ে গেল।" প্রায় ৪০০০ বা ৫০০০ সৈন্যের রাজপুত বাহিনী মুসলমান বাহিনীর পথরোধ করল। ভয় পেয়ে মুসলমানরা পিছিয়ে মূল শিবিরে ফিরে এল।

সংগ্রাম সিংহ তৎকালীন ভারতের সর্বাপেক্ষা বীর যোদ্ধা ছিলেন এবং তাঁর শরীরে ৮২টা আঘাতের চিহ্ন ছিল। সংগ্রাম সিংহ ও রাজপুতদের বীরত্বের কথা বাবর ও তাঁর সেনাপতিদের কানে কিছু কিছু পৌঁছেছিল। তাই গুপ্তচরেরা যখন খবর আনল যে, রাজপুতরা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, মোগল শিবিরে সে সংবাদ মহা ত্রাসের সঞ্চার করল। বাবর লিখছেন, ''At this time, as I have already observed, in consequence of preceding events, a general consternation and alarm prevailed among great and small. There was not a single person who uttered a manly word, nor, an individual who delivered a manly opinion.''(125)—অর্থাৎ, "এর আগেও অনেক ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করেছি এবং এবারও লক্ষ্য করলাম যে, আমার বাহিনীর উচ্চ-নিচ সকলের মধ্যেই এক মহা আতঙ্ক ও ভয় বিরাজ করছে। সে সময় কারও মুখ থেকেই পুরুষোচিত কোন কথা শোনা গেল না বা পুরুষোচিত কোন পরামর্শও পাওয়া গেল না।"

ফতেপুর সিক্রির নগর প্রাচীরের বাইরে ছিল বাবরের শিবির আর ভিতরে ছিল রাজপুত শিবির। রাজপুত বাহিনীতে যে সব বীর সেনাপতিরা ছিলেন তাঁরা হলেন, রাওয়াল উদয় সিংহ, মেদিনী রায়, ভামল, বর্মদেব ও রায়সিন দুর্গের প্রধান শিলাদিত্য। এছাড়া মোগল বিদ্বেষী কয়েকজন আফগান সেনাপতিও রাজপুত বাহিনীতে ছিল। এরা হল, হাসান খাঁ ও সিকন্দর লোদী। কনওয়াহাতে মার খেয়েই বাবরের সেনাপতিরা বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল এবং তারা বাবরকে যুদ্ধ না করেই ফিরে যাবার পরামর্শ দিতে লাগল।

এ থেকে বোঝা যায় যে, সংগ্রাম সিংহ যদি কনওয়াহা থেকে মোগলদের পিছু ধাওয়া করতেন, তবে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল।

---

(124) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, IV, 267. (125) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, IV, 269.

কিন্তু তা না করে সংগ্রাম সিংহ সময় নিলেন। ফলে মোগল বাহিনী নিজেদের প্রস্তুত করতে সময় পেয়ে গেল।

বাবর এই সময় শিলাদিত্যের মাধ্যমে সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করার চেষ্টা করে এবং ঘুষ দিয়ে শিলাদিত্যকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসে। শিলাদিত্যের এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে রাজপুতদের অনেক গোপন তথ্য বাবরের হাতে চলে যায়। ১৭ই মার্চ, সিক্রির অদূরে, আগ্রা থেকে প্রায় ৩৭ মাইল দূরে, খানুয়ার প্রান্তরে দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথেই বিশ্বাসঘাতক শিলাদিত্য তার লোকজন নিয়ে বাবরের পক্ষে যোগ দেয়। উপরন্তু দুই আফগান সেনাপতিও মুসলমানদের সঙ্গে তেমন ভাবে যুদ্ধ করল না।

মোগল বাহিনীতে কত সৈন্য ছিল তা জানা যায় না। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে রাজপুত বাহিনীতে প্রায় ২ লক্ষ সৈন্য ছিল।[126] ঐতিহাসিক টড-এর মতে রাজপুত বাহিনীতে ৮০ হাজার ঘোড়সওয়ার ও ৫০০ হাতী ছিল।[126]

যাই হোক, দশ ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধের পর যুদ্ধের ফলাফল যখন সম্পূর্ণভাবে রাজপুতদের পক্ষে, এমন সময় সংগ্রাম সিংহ গুরুতরভাবে আহত হলেন। ফলে তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে হল। সংগ্রাম সিংহকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যেতে দেখে রাজপুতদের মনোবল ভেঙে গেল। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করল এবং যুদ্ধের গতি বাবরের পক্ষে চলে গেল।

বাবর তার আত্মজীবনীতে লিখছেন, ''Having defeated the enemy, we pursued them with great slaughter. Their camp might be two kos distant from ours. On reaching it, I sent on Muhammadi and some other officers, with the order to follow them in close pursuit, slaying and cutting them off, so that they should not have the time to re-assemble.''[127] —অর্থাৎ, "শত্রুকে পরাজিত করার পর আমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলাম এবং ব্যাপকভাবে হত্যা করতে থাকলাম। আমাদের শিবির থেকে প্রায় ২ ক্রোশ দূরে ছিল তাদের শিবির। সেখানে পৌঁছে আমি মুহম্মদী ও আর কয়েকজন সেনাপতিকে হুকুম দিলাম

(126) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 36.
(127) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, IV, 272.

তাদের হত্যা করতে, কেটে দুখান করতে, যাতে তারা আবার একত্রিত হবার (অর্থাৎ প্রতি-আক্রমণ করার) সুযোগ না পায়।" এই বিবরণ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মোগল বাহিনী রাজপুতদের তাড়া করে সিক্রি নগরের অভ্যন্তরে রাজপুত শিবির পর্যন্ত ধাওয়া করে এবং তারপর শুরু হয় সামরিক ও অসামরিক হিন্দুর নির্বিচারে গণহত্যা।

কত হিন্দুকে সেদিন হত্যা করা হয়েছিল তার কোন হিসাব পাওয়া যায় না। বাবর হুকুম দিল কাছাকাছি একটা পাহাড়ের কাছে সমস্ত নরমুণ্ড জড়ো করে একটা স্তম্ভ তৈরি করতে—"On this hillock, I directed a tower of the skulls of the infidels to be constructed."(122) "Immense numbers of the dead bodies of the pagans and apostates (Afghans) had fallen in their flight, all the way to Bayana and even as far as Allwar and Mewat."(127)—অর্থাৎ, "সেই টিলার ওপর কাটামুণ্ডের একটা মিনার বানাতে হুকুম দিলাম। বিধর্মী (হিন্দু) ও ধর্মত্যাগীদের (আফগানদের) অসংখ্য মৃতদেহ পথেঘাটে ছড়িয়ে ছিল। এমন কি, দূর দেশ আলোয়ার, মেওয়াট ও বায়ানা যাবার পথেও বহু মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল।"

মুসলমানরা এদেশে আসার আগে আমাদের দেশের রাজাদের মধ্যেও যুদ্ধ হত। সেই যুদ্ধের সময় অনেক রকম আইন-কানুন মানা হত। সেই সব আইন-কানুন কেমন ছিল মহাভারত থেকে তার আভাষ পাওয়া যাবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ভীষ্ম যুদ্ধের কিছু আইন-কানুন ঘোষণা করেন, যা পরবর্তী কালে ভারতীয় রাজারাও মেনে চলতেন। ভীষ্ম পর্বের প্রথম অধ্যায়ে, ২৭ থেকে ৩২ শ্লোকে সেই সব আইন-কানুন বলা হয়েছে, যেমন (১) সন্ধ্যাবেলা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হলে কোন রকম বৈরিতা থাকবে না, সকলের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকবে। (২) যে ব্যক্তি বাগ্‌যুদ্ধে রত রয়েছে তার সাথে শুধু বাগ্‌যুদ্ধই করতে হবে। (৩) রথীর সঙ্গে রথী, হাতী-সওয়ারের সঙ্গে হাতী-সওয়ার, ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে ঘোড়সওয়ার, এবং পদাতিকের সঙ্গে পদাতিকই যুদ্ধ করবে। (৪) যার যেমন যোগ্যতা, ইচ্ছা, উৎসাহ ও বল, তার সাথে সেই রকম প্রতিপক্ষই যুদ্ধ করবে এবং এ ব্যাপারে প্রতিপক্ষ আগে তাকে সাবধান করবে।

কোন্ কোন্ ব্যক্তি অবধ্য সে ব্যাপারে নিয়ম হল, (১) যে সৈন্যবাহিনী থেকে বাইরে গিয়েছে, (২) যে ব্যক্তি অসাবধান বা অপ্রস্তুত রয়েছে, (৩) যে ব্যক্তি যুদ্ধ দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে, (৪) যে অন্য একজনের সাথে যুদ্ধে রত রয়েছে, (৫) যে বশ্যতা স্বীকার করেছে, (৬) যে পিঠ দেখিয়ে পালাচ্ছে এবং (৭) যার অস্ত্র ভেঙে গিয়েছে বা কবচ কেটে গিয়েছে, তারা সকলেই অবধ্য। এছাড়া রথের সারথী, অস্ত্রবাহক এবং ভেরী ও শঙ্খবাহক, এরাও অবধ্য। যুদ্ধের এই নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন ভারতীয় হিন্দু সমাজের যে সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় তার তুলনা অন্য কোন মানবসমাজে এক অকল্পনীয় ব্যাপার।

উপরিউক্ত নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়। যুদ্ধ শুধু সামরিক ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোন অসামরিক প্রজার রক্তপাত ঘটানো ছিল চিন্তার বাইরে। প্রকৃতপক্ষে তখন দুই রাজার সেনাদের মধ্যে যখন যুদ্ধ হত তখন অসামরিক সাধারণ প্রজারা যুদ্ধ দেখতে চতুর্দিকে জড়ো হত।

কিন্তু বর্বর মুসলমানরা যখন ভারত আক্রমণ করল তখন তারা কোন নিয়ম-নীতির ধার ধারল না। লক্ষ লক্ষ পরাজিত হিন্দু সৈন্যকে কেটে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল। লক্ষ লক্ষ অসামরিক নিরীহ প্রজা হত্যা করে মৃত মানুষের পাহাড় তৈরি করল। অনেক সময় এমন হত যে মুসলমানরা কোন হিন্দুর দুর্গ অবরোধ করেছে এবং রাজা বশ্যতা স্বীকার করছেন না। মুসলমানরা তখন অসামরিক প্রজাদের হত্যা করে, তাদের ঘরবাড়ি ও খেতের ফসল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করত যে হিন্দু রাজা বশ্যতা স্বীকার করে দুর্গ সমর্পণ করতে বাধ্য হতেন। যেই যেই যুদ্ধে হিন্দু রাজারা জয়ী হতেন সেই সব ক্ষেত্রেও তাঁরা বহু দিনের সংস্কারবশতঃ পরাজিত মুসলমান সৈন্যদের হত্যা না করে ছেড়ে দিতেন। পক্ষান্তরে মুসলমানরা পরাজিত হিন্দু বাহিনীর সকলকেই হত্যা করত। তাই হিন্দু রাজারা যে বার বার মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়েছেন তার জন্য হিন্দুর সভ্যতার সংস্কারও অনেকাংশে দায়ী। পরাজিত শত্রু অবধ্য, এই সভ্য সংস্কারের বশেই রাজা পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই সুসভ্য আচরণই তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু ডেকে এনেছিল।

এই সব ঘটনা থেকে এটাই পরিষ্কার হয় যে, অত্যন্ত সুসভ্য হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে লালিত-পালিত হবার ফলে আমাদের রাজাদের পক্ষে বর্বর মুসলমানদের চরিত্রই বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। আমাদের রাজারা যুদ্ধের মধ্যেও শিষ্টাচারের কথা ভাবতেন। ভাবতেন যে রাজা যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগের দিন রাত্রে কৌরব শিবিরে গিয়ে সকল গুরুজনদের প্রণাম জানিয়ে এসেছিলেন, তখন কেউ তাঁকে বাধা দেয়নি বা বৈরিতা করেনি। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, মুসলমানরা এই সব শিষ্টাচারের কোন ধার ধারে না। বুঝতে পারেননি যে মুসলমানরা শুধু সামরিক যুদ্ধ নয়, কোরানের কাফের নিধনের তত্ত্ব দ্বারা চালিত এবং ঐ পরিস্থিতিতে তারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে পণবন্দী করে পাণ্ডব সৈন্যদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করত।

অন্যান্য মুসলমান হানাদারের মত বাবরও হিন্দু মন্দির ও হিন্দু বিগ্রহ ধ্বংস করার মত বর্বরতার বহু স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। বাবর সম্ভল ও চান্দেরীর মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করেন। বাবরের আদেশে তাঁর সেনাপতি মীর বাকি অযোধ্যার রাম জন্মভূমি মন্দির ভেঙে তাকে মসজিদে পরিণত করে। তা ছাড়া বাবর গোয়ালিয়রের নিকটবর্তী উভ্র জৈন মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করেন।[128]

বাবরের পৈশাচিক নরহত্যা, বন্দী হিন্দু নারী ও শিশুদের চামড়ার চাবুক দিয়ে মারা এবং তাদের সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করা ইত্যাদি আরও অনেক বর্বর কাজকর্ম গুরু নানক স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১৫২১ সালে বাবর তৃতীয়বার যখন ভারতে হানা দেন, গুরু নানক তখন লাহোর থেকে ৮০ কিমি. দূরে গুজরানওয়ালা জেলার সৈয়দপুর বা বর্তমান আমিনাবাদে অবস্থান করছিলেন। পাঞ্জাবের স্বাধীনচেতা গক্করদের তাড়া খেয়ে বাবর উত্তরে পলায়ন করেন। প্রথমে শিয়ালকোট ও পরে সৈয়দপুর দখল করেন। সেখানে বাবর গণহত্যার আদেশ দিলেন। ফলে হাজার হাজার অসামরিক হিন্দু প্রজাকে হত্যা করা হতে থাকল। হাজার হাজার হিন্দু নারী ও শিশুকে বন্দী করে তাদের উপর নৃশংস অত্যাচার চলতে থাকল। এই সব নিরীহ মানুষের হত্যা ও নারী-শিশুর উপর অত্যাচার দয়ালু ও কোমল হৃদয় নানককে চরমভাবে ব্যথিত করল। তিনি লিখলেন—

---

(128) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 307.

"হে সৃষ্টিকর্তা ভগবান, জীবন্ত যম হিসাবে তুমি কি
দানবরূপী এই বাবরকে পাঠিয়েছ?
অমানুষিক তার অত্যাচার, পৈশাচিক তার হত্যালীলা।
অত্যাচারিতদের বুকফাটা আর্তনাদ ও করুণ ক্রন্দন
তুমি কি শুনতে পাও না?
তা হলে তুমি কেমন দেবতা? (129)

এ হেন এক নৃশংস, বর্বর ও কসাই বাবর সম্বন্ধে আমাদের ইতিহাস বইতে লেখা হচ্ছে যে, বাবর তৎকালীন নৃপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। তার চরিত্রে ৮টি বিশেষ গুণ ছিল, যেমন বিচক্ষণতা, মহৎ উচ্চাশা, যুদ্ধ নিপুণতা, সুদক্ষ শাসন কৌশল, প্রজা হিতৈষণা, উদার প্রশাসনিক আদর্শ, সৈন্যদের হৃদয় জয় করার ক্ষমতা ও ন্যায় বিচারের প্রবণতা।(130) সৌন্দর্যবোধ, সঙ্গীতানুরাগ, বিদ্যানুরাগ প্রভৃতি গুণেরও না কি বাবর অধিকারী ছিলেন। "তাছাড়া ফার্সী ভাষায় কাব্য রচনায় তিনি ছিলেন সুদক্ষ। স্ব-রচিত আত্মচরিত তার সাক্ষ্য বহন করে।"(130)

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ইতিহাসকে আমাদের তথাকথিত ঐতিহাসিকরা কতখানি বিকৃত করতে সক্ষম। ফারসী ভাষায় বাবরের কাব্য রচনার ব্যাপারে দু একটি কথা বলে নেওয়া এখানে উচিত হবে। লম্পট ও সমকামী বাবর বাবরি নামে গজনীর এক কিশোরের প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত হয়ে পড়েন। তার প্রেমে উন্মত্ত বাবর তাকে নিয়ে কবিতা লিখে তাঁর আত্মচরিতকে সমৃদ্ধ করেন। এই হল ফারসী ভাষায় কবিতা লেখার পিছনে বাবরের প্রেরণা।

ক্রমে বাবর বাবরি নামে সেই বালকের প্রতি এতখানি আসক্ত হয়ে পড়েন যে, বিবাহিতা স্ত্রী আয়েশার প্রতি তাঁর আকর্ষণ অত্যন্ত হ্রাস পায়। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন, "তখন আমি ১০, ১৫ বা ২০ দিন পর একবার তার কাছে যেতাম। তার প্রতি আমার আকর্ষণ খুবই কমে গিয়েছিল এবং এইজন্য মা খানুমের কাছে আমি বকুনি খেতাম।"(131)

বাবরির প্রতি তার আসক্তি বর্ণনা করে বাবর লিখছেন, "Before this I never had conceived a passion for anyone, and indeed never been so circumstanced as either

---

(129) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 306.
(130) Atul Chandra Roy, ibid, I, 16.

to hear or witness any words spoken, expressive of love or amorous passion. In this situation, I composed a few verses in person of which the following is a couplet—

Never was a lover so wretched, so enamored, so dishonoured as I,

And my fair never be found so pitiless, so disdainful as thou.''(131) এরকম আরও একটি কবিতায় বাবর লিখছেন,—

''I am abashed whenever I see my love,

My companion looks at me while I look to the other way.

....

I had neither strength to go nor power to stay

To such distraction you have reduced me

Oh my (male) sweetheart?''(131)

মুসলমান সমাজে সমকামিতার এত প্রাদুর্ভাব কেন সে ব্যাপারে দু একটি কথা বলা সঙ্গত হবে। অনেকের মতে বহুবিবাহ প্রথা বর্তমান থাকায় ধনী মুসলমানরা এককালে হাজার হাজার রমণীতে তাদের হারেম পূর্ণ করত, বর্তমানে বেশির ভাগ ধনী মুসলমানেরই একাধিক পত্নী আছে ইত্যাদি কারণে গরীব মুসলমানদের পক্ষে বিয়ের কনের অভাব বিদ্যমান। ফলে তারা অন্য পুরুষ এমন কি ইতর জীবজন্তুর সঙ্গেও যৌনক্রিয়া করতে বাধ্য হয়। তবে বাবরের মত ধনী মুসলমানদের সমকামিতায় আসক্তির কারণ যে বিকৃত যৌনরুচি তাতে কোন সন্দেহ নেই। আগেই বলা হয়েছে যে, মহম্মদ ঘোরী, কুতুবুদ্দিন আইবক ও আলতামস সমকামী ছিল এবং বলা চলে অধিকাংশ মুসলমান শাসকই ঐ পথের পথিক ছিল। ইসলামী মতে আল্লাহ ইহজগতে কিছু কিছু জিনিস মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন, যেমন মদ্যপান, রেশমের জামা-কাপড়, সোনার গহনা, সমকামিতা, ইতর জন্তুর সঙ্গে যৌনতা ইত্যাদি। তবে সুখের কথা হল, পরম করুণাময় রহমানির রহিম আল্লা তায়লা ইহলোকে যা যা নিষিদ্ধ করেছেন, পরলোকে তার অঢেল ব্যবস্থা

---

(131) Babur's Memoirs, Tr by John Leyden and William Erskine, Revised by Sir Lucal King, 125-126 (As quoted by P. N. Oak, Islamic Havoc in Indian History, ibid, 268.)

করবেন। তাই মুসলমানরা যখন আল্লার জান্নাতে (স্বর্গে) যাবে, তখন তারা সর্বক্ষণ সিল্কের জামা-কাপড় ও সোনা ও মণিমুক্তার গয়নায় সেজে থাকবে। তাদের চেয়ার-টেবিল, তৈজসপত্র, এমন কি চিরুনীখানাও সোনার হবে। প্রতিটি মুসলমান কয়েক হাজার করে সুন্দরী রমণী পাবে, যারা সব সময় কুমারী থাকবে এবং বয়স ১৬ বছরের বেশি হবে না। এই সবের সঙ্গে সঙ্গে আল্লা তাঁর মহিমাময় পবিত্র স্বর্গে প্রিয় বান্দাদের সমকামিতা চরিতার্থ করার জন্যও অঢেল ব্যবস্থা করবেন। প্রতিটি স্বর্গবাসী মুসলমান কম করে ৮০,০০০ ক্রীতদাস পাবে, যারা সবাই অতীব সুন্দর ও কিশোর বয়সী হবে। তাদের সকলের বয়স হবে ১৬ বছর এবং তা বাড়বেও না, কমবেও না।[132]

যাই হোক, আমাদের ঐতিহাসিকদের মতে বাবরের বন্ধুবাৎসল্য ও পিতৃপ্রেম ছিল অপরিসীম। তাঁদের মতে পুত্র হুমায়ুন কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে বাবর নিজের জীবনের বিনিময়ে হুমায়ুনের জীবন রক্ষা করতে আল্লার কাছে আর্জি পেশ করেন। আল্লাও তাঁর পরম ভক্ত কসাই বাবরের আর্জি কবুল না করে পারলেন না। ফলে বাবর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন আর হুমায়ুন ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু মজার কথা হল এই গল্প সমসাময়িক কোন মুসলমানের রচনায় বা বাবরের আত্মজীবনীতে অনুপস্থিত। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বাবরের মত একজন পাপাসক্ত লম্পট জল্লাদকে ভালমানুষ, হৃদয়বান মানুষ সাজাতে আমাদের ঐতিহাসিকরা কত নিচে নেমেছেন। কত আষাঢ়ে গল্প তাঁরা তৈরি করেছেন।

দিল্লী অধিকার করার পর (১৫২৬ খ্রীঃ) বাবর সুলতান ইব্রাহীম লোদিকে হত্যা করেন এবং তাঁর হারেমের মহিলাদের বন্দী করেন। সেই সময় লম্পট বাবর তাঁর মায়ের সমান বয়সী ইব্রাহীম লোদীর সুন্দরী মায়ের প্রতি আসক্ত হন। তাঁর জ্বালায় টিকতে না পেরে সেই মহিলা শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার চক্রান্ত করেন। সেই বিষাক্ত খাবার খেয়ে বাবর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুস্থ হয়ে বাবর ইব্রাহীম লোদীর মাকে কারাগারে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলেন। যে খাবারে বিষ মিশিয়েছিল, জীবন্ত অবস্থায় তার চামড়া ছাড়ানো হয় এবং অন্য এক চক্রান্তকারীকে হাতীর পায়ের তলায় পিষে মারা হয়। ১৫৩০ সালের

(132) Koran (76.19).

২৬শে ডিসেম্বর, মাত্র ৪৮ বছর বয়সে বাবরের মৃত্যু হয়।

যাই হোক, উপরিউক্ত বিবরণ থেকে কত হিন্দু খানুয়ার যুদ্ধের দিন বাবরের হাতে কাটা পড়েছিল তা অনুমান করা চলে। মুসলমানদের বিবরণ অনুসারে রাজপুত বাহিনীতে ২ লক্ষ সৈন্য ছিল। কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকদের মতে এই সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে বলা হয়েছে। তাই যদি ধরা যায় যে, রাজপুত বাহিনীতে সেদিন ১ লক্ষ সৈন্য ছিল, তবে মেনে নিতে হয় যে, ঐ ১ লক্ষ সৈন্যের সবাইকেই সেদিন হত্যা করা হয়েছিল। এর সঙ্গে অসামরিক লোকজনদের যোগ করলে বলতে হয় যে, কমপক্ষে দেড় থেকে দুলাখ হিন্দু সেদিন মুসলমানদের হাতে কাটা পড়েছিল।

আমরা আগেই দেখেছি যে, চিতোর দুর্গ দখল করে আকবর সেখানে হিন্দুর গণহত্যা করেছিলেন। ফলে পরবর্তী কোন রাজপুত রাজা সেই অভিশপ্ত দুর্গে আর পা রাখেননি। সেই থেকে চিতোর নগরীও চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত হয়, এবং ক্রমে তা শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে পরিণত হয়। কাজেই অনুমান করা চলে যে, খানুয়ার যুদ্ধের পরবর্তী গণহত্যার কারণে সিক্রি নগরীও পরিত্যক্ত হয় এবং ক্রমে তা গভীর জঙ্গলে পরিণত হয়। পরে আকবর সেই পরিত্যক্ত নগরীকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন মাত্র। বন-জঙ্গল কেটে এবং দুর্গের সংস্কার করে তাকে মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করে তুলেছিলেন। এবং এই সংস্কারের কাজকেই ঐতিহাসিকরা নির্মাণের কাজ বলে প্রচার করছেন।

সময়ের দিক দিয়ে বিচার করলেও এই অনুমান সত্য বলে মনে হয়। সকল ঐতহাসিকদের মতেই ১৪/১৫ বছরের মধ্যে আকবর ফতেপুর সিক্রি নগর তৈরি করে ফেলেন। কিন্তু ১৪/১৫ বছরের মধ্যে ফতেপুর সিক্রির সমস্ত দুর্গ প্রাসাদ, অট্টালিকা নির্মাণ করা এক অসম্ভব কাজ। কিন্তু কিছু কিছু সংস্কার করা, হিন্দুচিহ্ন লোপাট করে একটা মুসলীম চেহারা দেওয়া এবং সেই উদ্দেশ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন করা বা দু একটা মসজিদ তৈরি করা ইত্যাদি কাজ ১৪/১৫ বছরের মধ্যে করে ফেলা সম্ভব।

ফতেপুর সিক্রির সমস্ত প্রাসাদ, দুর্গ ও অট্টালিকা ১৪/১৫ বছরের মধ্যে তৈরি করা অসম্ভব বলেই জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন

যে, আকবর যেন যাদুমন্ত্রবলে ঐ অল্প সময়ের মধ্যে পুরো ফতেপুর সিক্রি নগরী নির্মাণ করে ফেলেন।[133] কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভিতরের জাম-ই-মসজিদ এবং বুলন্দ দরওয়াজাটাই আকবর নিজে তৈরি করেন (১৫৬১ খ্রীঃ)। এর সপক্ষে আর একটি অভ্রান্ত প্রমাণ হল—একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, সিক্রি দুর্গের ভিতরে যত প্রাসাদ আছে, যেমন দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, যোধাবাঈ প্রাসাদ, রাজা বীরবলের প্রাসাদ, তানসেনের প্রাসাদ, নবরত্ন সভা এমনকি শ্বেত পাথরে তৈরি সেলিম চিস্তির সমাধিও সম্পূর্ণ রাজপুত অথবা রাজপুত-গুজরাটী মিশ্র শৈলীতে তৈরি। আকবরের হারেমের দেওয়ালে উৎকীর্ণ করা রয়েছে পদ্মফুল, শিকল ও ঘণ্টা, যা নির্ভেজাল হিন্দু শৈলীর নিদর্শন। স্থাপত্যবিদ্‌দের মতে বীরবলের প্রাসাদের উপরের গম্বুজ ও সেলিম চিস্তির সমাধির উপরকার গম্বুজ পরবর্তিকালের সংযোজন।

"দেওয়ান-ই-খাস"-এর মধ্যে স্তম্ভের উপরে তৈরি যে আসন রয়েছে, যেখানে বসে আকবর তাঁর নতুন ধর্ম দীন-ই-ইলাহি প্রচার করতেন বলে বলা হয়ে থাকে, তা যে সম্পূর্ণভাবে জৈন স্থাপত্যশৈলীতে তৈরি তা সকল পুরাতত্ত্ববিদ্‌ই একবাক্যে স্বীকার করে থাকেন। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল, এটা পদ্মফুলের আকৃতিতে তৈরি। তেমনি, ৮৪টা স্তম্ভ বিশিষ্ট পাঁচ মহল যে সম্পূর্ণ হিন্দুশৈলীতে তৈরি, সে ব্যাপারেও তাদের মনে সন্দেহের অবকাশ নেই।[134] বিশেষ করে, দ্বিতীয় তলের ৫৬টা স্তম্ভ হিন্দুশৈলীর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই সব প্রমাণ করতে খুব একটা অসুবিধার কারণ নেই। স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কোন ব্যক্তির সামনেও যদি উদয়পুর, চিতোরগড় ও যোধপুরের প্রাসাদগুলির ছবির পাশে ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদগুলির ছবি রাখা হয় তবে তাদের মধ্যকার অপূর্ব সাদৃশ্য তাঁর চোখেও ধরা পড়বে।

কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকরা, যাঁরা প্রথমেই ধরে নেন যে ফতেপুর সিক্রির সব কিছুই আকবরের সৃষ্টি, তাঁরা এই সব হিন্দুশৈলী ব্যাখ্যা করতে সচরাচর এক আজব যুক্তি উপস্থিত করে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, মুসলমান শাসকরা হিন্দু কারিগর দিয়েই এই সব সৌধ তৈরি করত, তাই তাদের মধ্য দিয়ে এই সব স্থাপত্যের মধ্যে হিন্দুশৈলী প্রতিফলিত

(133) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 760.
(134) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 770.

হয়েছে। তাই 'যোধাবাঈ' প্রাসাদের হিন্দুশৈলী ব্যাখ্যা করতে শ্রী এস. কে. সরস্বতী লিখছেন, ''It is apparent that persons traditionally familiar with the indegenous architectural practices were responsible for the conception and construction of this beautiful palace.''(135)

এই সব যুক্তি নিতান্তই হাস্যকর। কারণ এই সব বিদেশী মুসলমান শাসকরা সকলেই হিন্দু ধর্ম তথা হিন্দুদের সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করতেন। তাই তাঁরা যদি এই সব প্রাসাদ নিজেরা তৈরি করতেন তবে তাঁরা কখনই তা ঘৃণিত হিন্দুশৈলীতে তৈরি করতেন না। সেই সব প্রাসাদের নক্‌শা করার জন্য তাঁরা অবশ্যই তুরস্ক, ইরান বা ইরাক থেকে শিল্পী ডেকে নিয়ে আসতেন। কিন্তু যেহেতু তাঁরা কিছুই নিজেরা তৈরি করেননি, শুধু হিন্দুর বাড়ীঘর ভোগ দখল করেছেন, তাই চরম ঘৃণা সত্ত্বেও হিন্দু স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হয়েছেন।

যাই হোক, এই সব বিবাদ মীমাংসার একটাই উপায় আছে, তা হল প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাই প্রমাণ করতে সক্ষম যে, এই সব প্রাসাদ অট্টালিকা মুসলমানরা তৈরি করেছে, না কি মুসলমানরা ভারতে আসার অনেক আগেই ঐ সব দুর্গ-প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে! একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানই পারে মিথ্যার অন্ধকার দূর করে সত্যকে প্রকাশ করতে। মিথ্যার অন্ধকার ভেদ করে সত্যের আলোকে ভারতের ইতিহাসকে আলোকিত করতে।

---

(135) R. C. Majumdar, ibid, Bharatiya Vidya Bhavan, VII, 768.
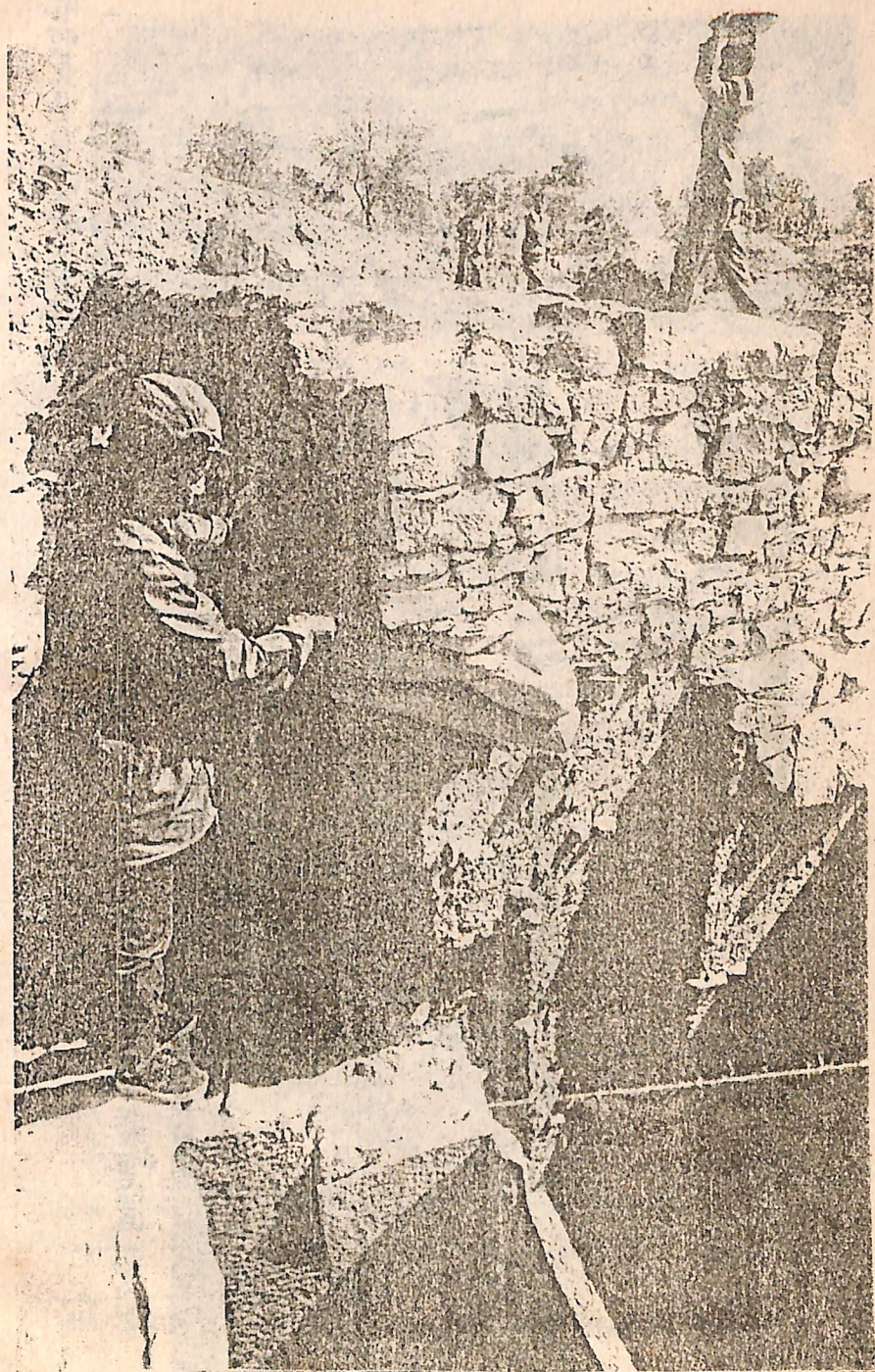
পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের লোকেরা দেওয়ালে গাঁথা জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি উদ্ধার করছে

ফতেপুর সিক্রির বীর ছবিলী দাস ঢিবিতে প্রাপ্ত জৈন তীর্থঙ্করদের মস্তকবিহীন মূর্তি।
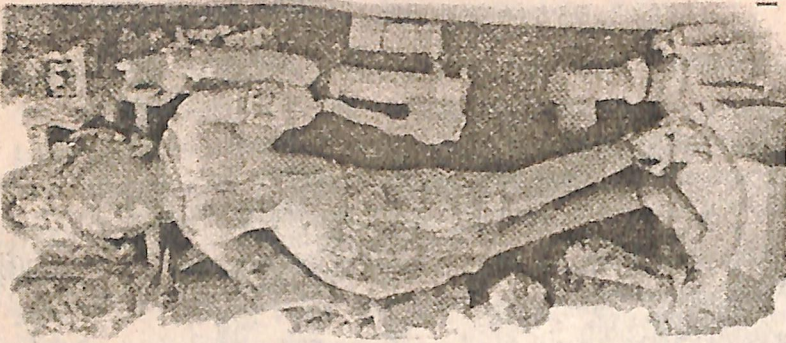
ফতেপুর সিক্রিতে প্রাপ্ত চতুর্ভুজ জৈন সরস্বতী মূর্তি

মিথ্যার অন্ধকার ভেদ করে সত্যের প্রকাশ

গত বছর (১৯৯৯ খ্রীঃ) আগস্ট মাসে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডঃ ধরমবীর শর্মা তাঁর তিনজন সহকারী, রমেশ মুলিমাণি (কর্ণাটক), কামেই অথৈলু কাবুই (মণিপুর) এবং আর. কে. তেওয়ারীকে সঙ্গে করে ফতেপুর সিক্রিতে উপস্থিত হন এবং প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করেন। মাত্র দু মাস চেষ্টার ফলেই তাঁরা প্রচুর পরিমাণে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি আবিষ্কার করেন, যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।[136]

প্রথমে যে টিবিটা নিয়ে তাঁরা কাজ শুরু করেন তার নাম বীর ছবিলী দাস টিবি। সেখান থেকে জৈন তীর্থঙ্করদের অনেক মূর্তি উদ্ধার করা হয়। ফতেপুর-সিক্রির সমস্ত হিন্দুচিহ্ন লোপাট করার উদ্দেশ্যেই আকবর ও তাঁর লোকজন ঐ সব মূর্তি মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখে। চুন সুরকি দিয়ে দেয়ালে গেঁথেও অনেক মূর্তি লোপাট করার চেষ্টা হয়েছিল। ডঃ শর্মার লোকেরা দেয়াল ভেঙে সেই সব মূর্তিও উদ্ধার করেন। কিছু মূর্তি দ্বিতীয় শতাব্দীর কুষাণ আমলের এবং কিছু মূর্তি চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর গুপ্ত আমলের বলে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

তবে সব মূর্তিই মস্তকহীন এবং ডঃ শর্মার অনুমান যে, মুসলমানরা হাতুড়ী বা অন্য কোন ভারী জিনিস দিয়ে মূর্তিগুলোর মাথা ভেঙে দিয়েছে। নিকটবর্তী আর একটি টিবি থেকে কিছু পোড়ামাটির নিদর্শনও উদ্ধার করা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে সেগুলো কমপক্ষে খ্রীঃ পূঃ ১২০০ সালে তৈরি। এই সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ করে যে, আকবরের অন্তত ১০০০ বছর আগেও সিক্রি একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল।

সংস্কৃত ভাষায় লেখা কিছু শিলালিপিও উদ্ধার করা হয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে, এককালে ঐ অঞ্চলের সংস্কৃত নাম ছিল 'সৈকরিক্য' এবং ডঃ শর্মা ও অন্যান্য পণ্ডিতদের বিশ্বাস যে, সংস্কৃত

---

(136) Sikri's New Past, S. Kalidas, India Today, Feb. 28, 2000.

'সৈকরিক্য' থেকেই আজকের সিক্রি শব্দ এসেছে। এককালে যে ওখানে বিশাল এক জৈন মঠ ছিল তারও অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। মুসলমানরা বিশেষ করে আকবরের লোকজনই যে ঐ মঠ ধ্বংস করেছে তা বলাই বাহুল্য। সবথেকে বড় কথা হল, আকবর ফতেপুর সিক্রি নগরের প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই সব আবিষ্কার সেই মিথ্যা প্রচারের উপর মরণ আঘাত হেনেছে। এবং এই আবিষ্কারের জন্য স্কুল-কলেজের সমস্ত ইতিহাস বইগুলোর সংশোধন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। বর্তমানে 'অনুপ তালাও' নামে একটা জলাশয়ের নিচে খনন কার্য চলছে। (137)

তবে ডঃ শর্মা ও তাঁর দলবল মূল ফতেপুর সিক্রি দুর্গে এখনও কাজ শুরু করেন নি। যে দিন সেই কাজ শুরু হবে, আশা করা যায় সেদিন আরও অনেক মূল্যবান নিদর্শন আবিষ্কৃত হবে এবং ঐ দুর্গ যে রাণা সংগ্রাম সিংহের দুর্গ ছিল তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হবে।

কাজেই আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ফতেপুর সিক্রিতে যার শুভ সূচনা হয়েছে, তা শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, ক্রমে লালকেল্লা, আগ্রাদুর্গ, তাজমহল, কুতুব মিনার ইত্যাদি সব জায়গাতেই প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান শুরু হবে। অনেক অজানা তথ্য প্রকাশিত হবে, সত্য উন্মোচিত হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের যে মিথ্যার ইতিহাস এতদিন চলে আসছে তা বন্ধ হবে। সম্পূর্ণ নতুন করে ভারতবর্ষের সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস লেখা শুরু হবে।

সূর্য উঠলে সাধু লোকেরা আনন্দিত হয়, এবং নিশাচর চোর-ডাকাতরা ভীত হয়, এটাই চিরকালীন সত্য। তাই ফতেপুর সিক্রিতে উপরিউক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার জাতীয়তাবাদী, সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস-প্রেমীদের কাছে এক দারুণ সুসংবাদ। পক্ষান্তরে দেশদ্রোহী সেকুলারপন্থী নেহরুমার্কা ঐতিহাসিকদের কাছে এটা এক চরম দুঃসংবাদ। স্বাভাবিক কারণেই এই আবিষ্কার সেকুলার ঐতিহাসিকদের শিবিরে এক মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ (আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া)-এর কাজকর্ম তদারক করার জন্য একটি সংসদীয় কমিটি আছে এবং জাতীয় কংগ্রেস দলের বিশিষ্ট নেতা শ্রী এদোয়ার্দো ফেলেইরো মহাশয়

---

(137) Annie Mathews, Housecalls, May-June, 2000.

তার একজন অন্যতম সদস্য। গত ৬ই জুলাই, ২০০০, তারিখে ঐ কমিটির এক জরুরী সভা ডাকা হয় (৮ই জুলাই-এর 'বর্তমান' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ দ্রষ্টব্য)। উক্ত সভায় শ্রীফেলেইরো সহ অন্যান্য সেকুলারবাদী সদস্যরা ফতেপুর সিক্রিতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অনুসন্ধান ও গবেষণাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে বর্ণনা করেন এবং তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন।

শ্রীফেলেইরো ঐ সভায় আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ফতেপুর সিক্রির কাজকর্মকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন এবং বলেন যে, সেখানে তারা যেন হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি এবং মন্দিরের ধ্বংসাবশেষই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। শ্রীফেলেইরো আরও বলেন যে, আর্কিওলজিকাল সার্ভে তাদের খোঁড়াখুঁড়ির খবর আগে থেকেই সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়ে দিয়ে খুবই অন্যায় করছে। অথচ তার আগে অনেক গবেষণা হওয়া দরকার। সে কাজ না করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে না। তিনি অভিযোগ করেন যে, এভাবেই তারা বাবরি মসজিদ নিয়ে হঠকারী মন্তব্য করেছিল, যা থেকে পরে সন্দেহের পরিবেশ তৈরী হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছিল।

শ্রীফেলেইরোর উপরিউক্ত কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটি বিষয় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এটা সকলেরই জানা আছে যে, আগে খোঁড়াখুঁড়ি হয় এবং খোঁড়াখুঁড়ি করে কোন নিদর্শন পেলে তা নিয়ে গবেষণা হয়। কিন্তু শ্রীফেলেইরোর মতে, খোঁড়াখুঁড়ির আগে সংবাদ মাধ্যমকে জানানো উচিত নয় এবং গবেষণা হওয়া উচিত। এই মন্তব্যের মধ্যে যে চক্রান্তের ইঙ্গিত রয়েছে তা হল, খোঁড়াখুঁড়ি করার আগেই গবেষণা করে অনুমান করতে হবে যে, খোঁড়াখুঁড়ি করে কি নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। যদি দেখা যায় যে সেই সব নিদর্শন মুসলমান তোষণকারী সেকুলারবাদের পরিপন্থী হবে, তবে খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ রাখতে হবে। অনাদি কালের জন্য সত্যকে মাটি-চাপা দিয়ে রাখতে হবে, প্রকাশ হতে দেওয়া চলবে না।

শ্রীফেলেইরোর আরও একটি মন্তব্যও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর অভিযোগ, আর্কিওলজিকাল সার্ভে তার খোঁড়াখুঁড়ির ফলাফল তড়িঘড়ি সমস্ত সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়ে দিচ্ছে। এখানেও তাঁর বদ মৎলব বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। তাঁর মতে খোঁড়াখুঁড়ি করে যা পাওয়া যাবে

তা গোপন রাখতে হবে। যে সব নিদর্শন সেকুলারবাদের পরিপন্থী, সেগুলোকে লোপাট করে দিতে হবে এবং যেগুলো সেকুলারবাদের অনুকূল সেগুলোই শুধু সংবাদ মাধ্যমকে জানাতে হবে। অর্থাৎ শ্রীফেলেইরোর দল এতদিন ধরে যে মিথ্যার প্রাসাদ তৈরি করেছে তাকে রক্ষা করতে হবে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার সে প্রাসাদকে যেন ধূলিসাৎ করতে না পারে। কাজেই প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া যাবে না। সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করা চলবে না।

যাই হোক, শ্রীফেলেইরো ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর শ্রীকোমল আনন্দকে দিয়ে একটা বিবৃতি লিখিয়ে নিতে সমর্থ হন এবং তাতে শ্রীআনন্দ লেখেন, "যাবতীয় অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে যে, সম্রাট আকবর কখনই কোন হিন্দু মন্দির ভাঙেননি বা মন্দির ভেঙে সেই জায়গায় কোন কিছু নির্মাণ করেন নি।"

কিন্তু কথা হল, এককালে ফতেপুর সিক্রিতে যে বিশাল এক জৈন মন্দির ছিল তা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত সত্য। সেই মন্দিরের জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তিই যে মাথা ভেঙে মাটির নীচে পুঁতে দেওয়া হয়েছে বা দেয়ালের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারেও সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, কে সেই মন্দির ভেঙেছে? আকবর ভেঙেছে কি না, তা গবেষণার ব্যাপার। তবে কোন একজন মুসলমান শাসকই যে তা ভেঙেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। হয়তো খানুয়ার যুদ্ধের পর আকবরের ঠাকুর্দা বাবরই তা ভেঙেছে। ভবিষ্যতের গবেষণাই তা সঠিক নির্ধারণ করতে পারে এবং তা একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

তাহলে শ্রীকোমল আনন্দকে দিয়ে তড়িঘড়ি একটা বিবৃতি লিখিয়ে নেওয়া হল কেন? অত্যন্ত চাপের মধ্যে শ্রীআনন্দকে যে ঐ বিবৃতি লিখতে বাধ্য করা হয়েছে তা বলাই বাহুল্য, কারণ কোন গবেষণা ছাড়া শ্রীআনন্দের পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে আকবর সেই মন্দির ভাঙেননি। কাজেই চাপ ছাড়া শ্রীআনন্দের মত ব্যক্তি এরকম একটা অবৈজ্ঞানিক বিবৃতি দিতে পারেন না।

তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তাড়াতাড়ি শ্রীআনন্দকে দিয়ে ঐ

বিবৃতি লিখিয়ে নেবার পিছনেও কাজ করছে সেই মুসলমান তোষণের নীতি। মুসলমান তোষণের জন্যই আকবরকে মহান আকবর বানানো হয়েছে, আর মুসলমান তোষণের জন্যই আকবরের সেই মহানত্বকে টিকিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে সত্যকে গলাটিপে হত্যা করে, বা ইতিহাসকে বিকৃত করেও তা করতে হবে।

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। শ্রীকোমল আনন্দকে দিয়ে বলানো হয়েছে যে, আকবর কোন মন্দির ভেঙে সেই জায়গায় প্রাসাদ তৈরি করেন নি। কারণ ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদ সেই মন্দির থেকে বেশ খানিকটা দূরে অবস্থিত।

এই বিবৃতির মাধ্যমে শ্রীকোমল আনন্দকে দিয়ে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়ে নেওয়া হয়েছে যে, ফতেপুর সিক্রির বর্তমান দুর্গ-প্রাসাদ আকবরই তৈরি করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে বর্তমান লেখকের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর বক্তব্য হল, সম্রাট আকবর ফতেপুর সিক্রিতে আদৌ কোন প্রাসাদ নির্মাণ করেননি। যে প্রাসাদ আকবর তৈরি করেছেন বলে আজ বলা হয়ে থাকে তা প্রকৃতপক্ষে রাজপুত রাজাদের তৈরি। আকবরের অনেক আগে, বাবরের সময়ও ঐ দুর্গ প্রাসাদ বিদ্যমান ছিল এবং তখন তা মহারানা সংগ্রাম সিংহের দুর্গ ছিল। আজ যদি ঐ প্রাসাদে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো হয় এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার বয়স নির্ধারণ করা হয় তবে এটাই দেখা যাবে যে, আকবরের বেশ কয়েক শতাব্দী পূর্বে ঐ দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। আরও দেখা যাবে যে, একমাত্র বুলন্দ দরওয়াজাটাই শুধু আকবর তৈরি করেছিলেন।

শ্রীএদোয়ার্দো ফেলেইরোর উপরিউক্ত একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, আর্কিওলজিকাল সার্ভে যেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি এবং হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষই খুঁজে বেড়াচ্ছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, যীশুর মূর্তি এবং গীর্জার ধ্বংসাবশেষ পেলে আমাদের মাননীয় ফেলেইরো সাহেব খুবই খুশী হতেন। অথবা নিদেনপক্ষে একটা মসজিদ পেলেও চলে যেত। কিন্তু তা নয়, সব জায়গা থেকে শুধু ঘৃণ্য হিন্দুর ঘৃণ্য মন্দির আর দেবদেবীই বেরিয়ে আসে।

মাননীয় শ্রীফেলেইরো সাহেব ভুলে যান যে, এই ভারতবর্ষ মন্দির আর দেবদেবীরই দেশ। গীর্জা ও মসজিদ খুবই হাল আমলে এদেশে

এসেছে। দুনিয়ায় যখন ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মের জন্ম হয়নি তখন মাননীয় ফেলেইরো সাহেবের বাপ-ঠাকুর্দারা মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীরই পূজা করেছেন। কিন্তু আজ তিনি বাপ-ঠাকুর্দার জাত-ধর্ম খুইয়ে এদোয়ার্দো হয়েছেন বটে, তবে সে পরিচয়ের শিকড় মাটিতে প্রবেশ করেনি। তাই মাটি খুঁড়ে তাঁর আসল পরিচয় বেরিয়ে পড়ছে। শুধু শ্রীফেলেইরো সাহেবকেই নয়, মাটি খুঁড়ে বের করা এই সব দেবদেবীর মূর্তি এই দেশের সমস্ত ধর্মান্তরিত মুসলমান ও খ্রীস্টানকে ডেকে এ কথাই বলছে, "দেখো, এটাই তোমার আসল পরিচয়। এই পরিচয়ের রক্তই তোমার ধমনীতে বইছে।"

বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ (৮ই জুলাই, ২০০০)

পুরাতত্ত্ব বিভাগের অনুসন্ধানে জানা গেল মন্দির ভেঙে ফতেপুর সিক্রিতে প্রাসাদ বানাননি আকবর

নয়াদিল্লী, ৭ জুলাই (পি টি আই) ঃ ফতেপুর সিক্রিতে হিন্দু মন্দির ভেঙে মুঘল সম্রাট আকবর তাঁর প্রাসাদ বানিয়েছিলেন বলে যে রটনা আছে তা ঠিক নয় বলে জানিয়েছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া। সার্ভের ডিরেক্টর জেনারেল কোমল আনন্দ বলেছেন, যাবতীয় অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গিয়েছে, সম্রাট আকবর কখনই কোনও হিন্দু দেবমন্দির ভাঙেননি বা সে জায়গায় কোনও কিছু নির্মাণ করেননি। ফলে বিভিন্ন মহল থেকে ফতেপুর সিক্রির সঙ্গে অযোধ্যার রাম মন্দির বাবরি মসজিদের যে তুলনা টানা হচ্ছে তা ঠিক নয়। এ নিয়ে কোনও তর্কবিতর্ক তার ফলে অনেক কমে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিত কোমল আনন্দ জানিয়েছেন, ফতেপুর সিক্রিতে আকবরের প্রাসাদ এবং ওই মন্দির অনেক তফাতে। দুটির সঙ্গে কোনও যোগও নেই। সংবাদ সংস্থার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি ওই কথা জানিয়েছেন। তাঁর মতে, দুটি স্থান নিয়ে ওই ধরনের সন্দেহ প্রকাশের আর কোনও অবকাশই থাকছে না।

পুরাতত্ত্ব বিভাগ বেশ কয়েকদিন ওই এলাকায় খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চালাচ্ছে। সেখান থেকে মিলেছে ১০১০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তৈরি জৈন সরস্বতীর চতুর্ভুজ মূর্তি। দাঁড়ানো অবস্থায় এই মূর্তিটি পূজিত হতেন। এখানে একটি মন্দির ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। তবে সেই সম্ভাব্য মন্দিরের এলাকা থেকে আকবরের প্রসাদটি অনেক দূরে। ফলে তিনি মন্দির ভেঙে প্রাসাদ তৈরি করিয়েছিলেন এ যুক্তি ধোপে টেঁকে না।

পুরাতত্ত্ব বিষয়ে সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটি গতকাল এক আলোচনা বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানে আর্কিওলজিকাল সার্ভের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজকর্ম নিয়ে তীব্র সমালোচনা ওঠে। কমিটির অন্যতম সদস্য এদুয়ার্দো ফেলেইরো রীতিমতো ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেন, আর্কিওলজিকাল সার্ভে এমনভাবে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করেছে যাতে সন্দেহ হতে পারে যে, তারা বুঝি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি বা মন্দিরের অবশিষ্টই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এতে নতুন করে ধর্মীয় সন্দেহ ও পারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হবে। মনে

হবে, বিভিন্ন সময়ে অহিন্দু শাসকরা বুঝি হিন্দু মন্দির ভেঙে সেখানে অন্য কিছু গড়ে তুলেছেন। কমিটির এই ক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে সার্ভের ডিরেক্টর জেনারেলের ওই মন্তব্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ফেলেইরো বলেছেন, আর্কিওলজিকাল সার্ভে তাদের খোঁড়াখুঁড়ির খবর আগে থেকে সংবাদ মাধ্যমকে দিয়ে দিচ্ছে। অথচ তার আগে অনেক গবেষণা দরকার। সেকাজ না করে ধর্ম সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে না। এভাবেই বাবরি মসজিদ নিয়ে তারা এমন সব মন্তব্য শুরু করেছিল যা থেকে সন্দেহের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত মসজিদটিকে ভাঙা হয়েছিল।

কোমল আনন্দ অন্যদিকে জানিয়েছেন, ফতেপুর সিক্রি নিয়ে যে রিপোর্ট আর্কিওলজিকাল সার্ভে প্রকাশ করেছে তা প্রাথমিক। ব্যাপারটি নিয়ে গবেষণা চালানো হবে। তারপর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে।

কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশের মজফফরপুরে হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন নিয়েও চূড়ান্ত রিপোর্ট বের করা হবে আরও পরে। তবে তার আগে বিচার বিভাগীয় কোনও ব্যাপার আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সৌজন্যে—বর্তমান

পরিশিষ্ট

হিন্দু ধর্মে জাতিভেদ প্রথা *

মুসলমান আলিমগণ এবং আমাদের সাম্যবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার বুদ্ধিজীবিগণ হিন্দুধর্মকে সদাসর্বদা নিন্দা করেন এবং গালাগালি দিয়ে থাকেন, কারণ তাঁদের মতে হিন্দুধর্মে অতিশয় অ-মানবিক এবং অত্যন্ত ঘৃণ্য জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান। তাঁরা মনে করেন যে, এই জাতিভেদ প্রথা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে। এর ফলে নিম্ন বর্ণের লোকেরা মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং উচ্চ বর্ণের লোকদের দ্বারা নির্যাতিত হয়। এই সব প্রসঙ্গ আলোচনাকালে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা হিন্দুধর্মকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বলে থাকেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা এটাই বোঝাতে চান যে, হিন্দু ধর্ম ব্রাহ্মণদের দ্বারা সৃষ্ট এক মতবাদ বা নিষ্পেষণ যন্ত্র যাতে ব্রাহ্মণদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্বীকৃত এবং এর দ্বারা ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সকলেই, বিশেষ করে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা বা শূদ্ররা নিগৃহীত ও নিষ্পেষিত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এটাও প্রচার করে থাকেন যে, ইসলাম একটি মহান সাম্যবাদী ধর্ম কারণ এতে জাতিভেদ প্রথা নেই। তাঁরা দেখান যে, ইসলামে কোন ঘৃণার পরিবেশ নেই এবং অতি দরিদ্র মুসলমান ও মুসলমান রাজা উজিররা এক সঙ্গে মসজিদে নামাজ করে। কিন্তু ঐতিহাসিক তারা চাঁদ তাঁর "History of Freedom Movement in India" গ্রন্থে লিখছেন যে, "All census reports before 1931 give a long list of Muslim castes and there is no doubt whatsoever that in 18th century Muslim inhabitants in India followed the pattern of the Hindu society................This was un-Islamic but an awakening against it was impossible at that time" (Vol-I, p-100)।

---

* আপাত দৃষ্টিতে এই বিষয়টি গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে সাম্যবাদী ও সেকুলার ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবিগণ হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম বা বর্তমান জাতিভেদ প্রথাকে অত্যন্ত বিকৃতভাবে পরিবেশন করেন এবং জনসাধারণের মনে ভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। এই কারণে বিষয়টি পৃথকভাবে আলোচিত হল।

শ্রী তারা চাঁদ আরও লিখছেন যে, "মুসলমান জাতিদের মধ্যে সবার উপরে ছিল সৈয়দদের স্থান। সম্রাট ঔরঙজেব মনে করতেন যে, কোন সৈয়দকে, শারীরিক বা মানসিক, কোনভাবে আহত করা ইসলাম বিরোধী কাজ এবং তাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করা ইসলামী রীতিরই অন্তর্গত। এই সব সৈয়দদের বেশীর ভাগই ছিল পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত বিদেশী। উচ্চ বর্ণের হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হলে তাকে বলা হত নও-মুসলমান বা শেখ। নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়ে নীচু জাতের মুসলমান বলেই গণ্য হত এবং সমষ্টিগত ভাবে তাদের 'রাধিল' বলা হত। সৈয়দরা বা অন্যান্য উচ্চ বর্ণের মুসলমানরা রাধিলদের কাফেরের সমান বলেই মনে করতো এবং তাদের সঙ্গে কোন রকম বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা ছিল চিন্তার অতীত। মুসলীম সমাজের এই জাতিবিভাগ আজও বিদ্যমান আছে। আজও এক জন সৈয়দ মুসলমানদের মধ্যে ব্রাহ্মণের সম্মান পেয়ে থাকেন।

আমাদের এই সব সেকুলার মার্কা বুদ্ধিজীবীর দল, নিজেদের অজ্ঞতার জন্যই হোক আর হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির গায়ে কালিমা লেপন করার জন্যই হোক, জাতিভেদ প্রথা এবং বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। তাঁদের এটাও জানা নেই যে, শুধু বর্ণাশ্রম ধর্মই হিন্দু শাস্ত্রাদি দ্বারা নির্দিষ্ট এবং ছোঁয়াছুঁয়ি বা অস্পৃশ্যতা হিন্দুশাস্ত্রে অনুপস্থিত। কাজেই আজকের হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যতার যে জাতভেদাভেদ চলছে তার জন্য হিন্দুশাস্ত্র দায়ী নয়। সমাজের কিছু মানুষকে অস্পৃশ্য বলে দূরে সরিয়ে রাখা এবং ঘৃণা করা অত্যন্ত নিন্দার্হ সন্দেহ নেই, তবে মুসলমানরা এদেশে আসার আগে হিন্দু সমাজে জাতিভেদ ছিল, কিন্তু অস্পৃশ্যতা ছিল না। ঐ সময় ইসলামের আক্রমণ থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার জন্য সমাজপতিরা অতিশয় রক্ষণশীল হয়ে পড়েন এবং তার ফলেই অস্পৃশ্যতার সৃষ্টি হয়।

বর্ণাশ্রম ধর্ম বা জাতিভেদ প্রথা সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক। একে বলা চলে সমাজের শ্রমবিভাগ (division of labour) ব্যবস্থা। গীতা বলছে—"চাতুর্বর্ণাং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ" বা গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি চার বর্ণের সৃষ্টি করেছি। অথবা,

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।। (১৮ঃ৪১)

বা, স্বভাবজাত গুণ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কাজকর্ম পৃথক পৃথক বিভক্ত হয়েছে।

এইসব কথাবার্তা থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে, সমাজের সব লোক এক রকম নয়। তাদের স্বভাবজাত প্রবণতা ও দক্ষতাও ভিন্ন ভিন্ন এবং এর ফলেই শ্রম-বিভাজন বা বর্ণ-বিভাজন।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্মস্বভাবজম্।। (১৮ঃ৪২)

অর্থাৎ, যার মধ্যে শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা ইত্যাদি গুণ আছে ;জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় প্রবণতা ও সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা যার মধ্যে আছে, সেই ব্রাহ্মণ।

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্।। (১৮ঃ৪৩)

অর্থাৎ, পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য, কার্যকুশলতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা ইত্যাদি গুণ যাঁর মধ্যে আছে এবং যিনি দানে আগ্রহী এবং নেতৃত্ব দানের ক্ষমতাসম্পন্ন তিনিই ক্ষত্রিয়।

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্বকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।। (১৮ঃ৪৪)

অর্থাৎ, কৃষি, গো-পালন ও ব্যাবসা-বাণিজ্যে যার মন, সে-ই বৈশ্য। যার নিজস্ব কোন উদ্যম, প্রচেষ্টা বা কর্মোদ্যম নেই এবং পরের সেবা বা চাকুরি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে যার মন, সে-ই শূদ্র। এখানে দুঃখের কথা হল বর্তমান হিন্দু সমাজে শূদ্রের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং 'কলিযুগে সবাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হবে' এই শাস্ত্রবাক্য সত্য প্রমাণিত হতে চলেছে। এককালে শিক্ষক মর্যাদাপূর্ণ গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বৃটিশরা ভারতে এসে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার ফলে গুরুর টোল স্কুল কলেজের পাকা দালানে রূপান্তরিত হয়েছে বটে, কিন্তু শিক্ষক তার গুরুর আসন ও মর্যাদা হারিয়েছে। মাইনে করা চাকরে পরিণত হয়েছে। ব্রাহ্মণত্ব হারিয়ে শূদ্রে পর্যবসিত হয়েছে।

যাই হোক, পৃথিবীর সকল মানব সমাজে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম আজও বিদ্যমান। সব দেশেই ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা পঠন-পাঠন বা গবেষণা ইত্যাদি কাজ বেছে নিচ্ছেন। ক্ষত্রিয়ের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা সামরিক বাহিনী বা সমতুল্য কোন বৃত্তি বেছে নিচ্ছেন। বৈশ্যের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা ব্যবসা-বাণিজ্য বা সেই সংক্রান্ত কাজকর্ম বেছে

নিচ্ছেন আর শূদ্রের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা নিম্নমানের চাকুরি ইত্যাদিতে রত রয়েছেন। সব দেশেই সরকারী কর্মীদের এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের যে শ্রেণী বিভাগ রয়েছে সেটাও এক ধরনের বর্ণাশ্রম ধর্মই বটে এবং সাম্যবাদী দেশগুলোও এর বাইরে নয়। সেই সব সাম্যবাদী দেশেও বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের জন্য বেতনের বিভিন্নতা এবং সরকারী আবাসনের বিভিন্নতা বিদ্যমান রয়েছে। এই সব বিভিন্নতাই আজকের বর্ণাশ্রম ধর্ম, আজকের জাতিভেদ প্রথা।

এই পৃথিবীতে যত সাম্যবাদী বুদ্ধিজীবী আছেন তাঁরা সকলেই ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বে বিশ্বাসী। এই বিবর্তনবাদের মূল কথাই হল, মানুষ সহ সমস্ত জীবের মধ্যেই ব্যক্তিগত বিভিন্নতা বা individual difference বিদ্যমান রয়েছে। এই individual difference-এর সঙ্গে survival of the fittest যুক্ত হয়ে বিবর্তনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কাজেই তাঁদের মতে মানুষে মানুষে individual difference একটি শাশ্বত সত্য। সুতরাং বলা চলে যে, individual difference যদি শাশ্বত সত্য হয় তবে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ প্রথাও শাশ্বত সত্য। পক্ষান্তরে, মানুষে মানুষে সমস্ত প্রভেদ দূর করে সব মানুষকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার কথা তাঁরা বলে চলেছেন সেটাই অলীক কল্পনা এবং বর্ণাশ্রম ধর্মই বাস্তব সত্য। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশ' গ্রন্থে লিখছেন, "সমাজে বিভেদ আছে, বৈষম্য আছে এবং এই বিভেদকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া ঐক্য দান করা সম্ভব হইয়াছে।" কাজেই তফাত হল, ভারতের ঋষিদের দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম সঘোষিত সত্য, কিন্তু অন্যান্য দেশে, দৃষ্টিশক্তির স্থূলতা হেতু, তা অঘোষিত সত্য।

অনেক সাম্যবাদী পণ্ডিত হয়তো বলবেন যে, তাঁরাও মানুষে মানুষে individual difference স্বীকার করেন, তাই তাঁরা মানুষে মানুষে সমস্ত বিভেদ দূর করার কথা বলেন না। শুধু অর্থনৈতিক বিভেদ দূর করার কথাই বলে থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, অন্যান্য সমস্ত বিভেদ অটুট রেখে শুধু অর্থনৈতিক বিভেদ দূর করা কি সম্ভব? বাস্তবে দেখা গেছে যে সোভিয়েট রাশিয়ায় তা সম্ভব হয়নি এবং বর্তমান চীনেও তা সম্ভব হবার নয়। এমন কি কোন সাম্যবাদী রাষ্ট্র কি সম্ভব যেখানে কোন সংস্থার সর্বোচ্চ কর্তা এবং একজন ঝাড়ুদারের একই বেতন হবে?

আমাদের এই সব সাম্যবাদী বুদ্ধিজীবীরা শূদ্রদের জন্য খুবই চিন্তিত। শূদ্রদের দুঃখে তাঁদের ভীষণভাবে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে এবং শূদ্রদের জন্য তাঁদের চোখের জল ফেলারও বিরাম নেই। (নিন্দুকেরা একে কুম্ভীরাশ্রু বলে, কারণ দেখা গেছে যে, প্রয়োজনে এই শূদ্রদের গুলি করে মারতেও এই সাম্যবাদীদের হাত কাঁপে না। পশ্চিমবঙ্গের মরিচ ঝাঁপিতে তা খুব ভাল করেই প্রমাণিত হয়ে গেছে।) এই সব বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বাস করেন যে, আর্য হল একটি জাতি এবং এই আর্যরা বাইরে থেকে ভারতে এসেছে এবং সাবেক ভারতীয় কৃষিভিত্তিক সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে। তাই এই রকম একজন দিগ্‌গজ সাম্যবাদী পণ্ডিত শ্রীজয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ 'সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্‌গীতা'-র ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখছেন, "ইরান-আফগানিস্তান অঞ্চল থেকে আর্যরা যখন প্রথম এ দেশে আসে, তার অনেক আগে থেকেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে উন্নতমানের মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতা ছিল স্থায়ী কৃষি এবং নগর ভিত্তিক। ....আর মহেঞ্জোদারো হরপ্পার ধারাবাহী এই প্রাচীন সভ্যতাই ছিল আগ্রাসী আর্যদের প্রাথমিক লক্ষ্য। ....তুলনাক্রমে আর্যরা ছিল এক বর্বর জাতি। তারা কৃষিকাজ জানতো না, নগর সভ্যতা তো দূরের কথা, যাযাবর আর্যদের জীবিকার প্রধান উৎস ছিল পশুপালন। আর এদের প্রধান পারদর্শিতা ছিল ঘোড়ায় চড়া এবং যুদ্ধবিদ্যায়। ....প্রাচীনকাল থেকেই ইতিহাসে বহুবার বর্বরদের আক্রমণে অনেক উন্নত সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে। আর্য আক্রমণে এমনিভাবেই তৎকালীন উন্নত ভারতীয় সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল।"

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই সব ব্যাপারে জয়ন্তানুজবাবু ম্যাক্স মুলারের তত্ত্বকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে সরস্বতী নদীর ব্যাপারে অনুসন্ধান এবং সরস্বতী নদীতীরে গড়ে ওঠা বৈদিক সভ্যতার যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি আবিষ্কৃত হচ্ছে তার ফলে সমগ্র বিষয়টাই এক নতুন মোড় নিতে চলেছে। বিশেষ করে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সীলমোহরগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হওয়াতে দেখা যাচ্ছে যে সেগুলোর ভাষা সংস্কৃত এবং তা আদিকালের ব্রাহ্মী হরফে লেখা। এই সব তথ্যাদি এটাই প্রমাণ করতে চলেছে যে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার সভ্যতা ও সরস্বতী নদীতীরে গড়ে ওঠা সভ্যতা সামগ্রিকভাবে বৈদিক

বা আর্য সভ্যতা। কাজেই সেদিনের আর বেশী বাকী নেই যেদিন জয়ন্তানুজবাবু সহ সমস্ত সাম্যবাদী বুদ্ধিজীবীদের অলীক 'আর্য-আক্রমণ' তত্ত্ব এবং 'আর্য-অনার্য সংঘাত'-এর তত্ত্ব জঞ্জাল হিসাবে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

যাই হোক, এই সব বুদ্ধিজীবীদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, আর্যরা বাইরে থেকে এসে ভারতের আদিম অধিবাসীদের শূদ্র আখ্যা দিয়েছে এবং তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করে শোষণ করেছে। তাই জয়ন্তানুজবাবু লিখছেন, "তাছাড়া বৈদিক যুগের মধ্যভাগ থেকে ক্রমশঃ বিজিত অনার্যদের দাস বা শূদ্র শ্রেণীতে রূপান্তর, এবং আদিম শ্রম-বিভাজন ভিত্তিতে চাতুর্বর্ণের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক অসাম্যের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল" (ঐ-পৃঃ ১৫)। এই বৈদিক যুগ কত প্রাচীন? এ ব্যাপারেও আমাদের সাম্যবাদী বুদ্ধিজীবিগণ ম্যাক্স মুলারের মতকেই গ্রহণ করেছেন। পাশ্চাত্যের এই সমস্ত পণ্ডিতরা বাইবেলে বর্ণিত হাস্যকর সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মনে করতেন যে, ৪০০৪ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী বেলা ৯টার সময় গড এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই মতের উপর ভিত্তি করেই তাঁরা ভারতে আর্যদের তথাকথিত আগমনের কাল, ঋগ্বেদের ও অন্যান্য বেদ ও বেদান্তের রচনার কাল ১৫০০ থেকে ১০০০ খ্রীঃ পুঃ নির্ধারণ করে গিয়েছেন। কাজেই পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের বই পড়ে সভ্যতার হাতেখড়ি প্রাপ্ত আমাদের সাম্যবাদী বুদ্ধিজীবীরাও যে ঋগ্বেদ রচনার কাল ১২০০ থেকে ১০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ নির্ধারণ করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি! (ঐ-পৃঃ ৩৬)।

পাশ্চাত্যের এই সব পণ্ডিতরা ইয়োরোপের বর্বর ক্রীতদাস প্রথা এবং মধ্যযুগীয় অমানবিক সামন্তপ্রথার ইতিহাস পড়েছেন। তাই তাঁরা ভারতের ইতিহাসে সেই বর্বরতার আমদানী করে এক তত্ত্ব খাড়া করলেন। বললেন যে বর্বর আর্যের দল ভারতে প্রবেশ করে ভারতের আদিম অধিবাসীদের পরাজিত করে শূদ্র আখ্যা দিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। এইভাবে তারা ভারতে ক্রীতদাস প্রথার প্রবর্তন করেছে। আমাদের সাম্যবাদী বুদ্ধিজীবীর দলও এই তত্ত্ব কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই গ্রহণ করলেন। এর পিছনে কারণ হল, মার্কস সাহেব তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বে বলে গিয়েছেন যে, মানব সমাজ আদিম সমাজতন্ত্র, ক্রীতদাসপ্রথার ও সামন্তপ্রথার সমাজকে অতিক্রম করে

আজকের পূঁজিবাদী সমাজে পৌঁছেছে। তাঁদের মতে মার্কসের এই তত্ত্ব বিশ্বজনীন। তাই ভারতেও এককালে ক্রীতদাসপ্রথার সমাজ বিদ্যমান ছিল তা প্রমাণ করা এঁদের কাছে খুবই জরুরী হয়ে পড়ে। সেই কারণে দেশী বিদেশী বহু সাম্যবাদী পণ্ডিতই ভারতে ক্রীতদাস প্রথার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টার কোন কসুর করেননি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন (এই লেখকের 'মার্কস ও মার্কসবাদীদের অজ্ঞতা' দ্রষ্টব্য।) জয়ন্তানুজবাবুও তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থে অনেক সত্য-মিথ্যা উদ্ধৃতি সহযোগে শূদ্রদের উপর উচ্চ তিন বর্ণের দমন-পীড়ন ও আর্থিক শোষণ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ইয়োরোপের দাস কেনা-বেচার হাটে হাজার হাজার দাস কেনা-বেচার মত ভারতেও দাস কেনা-বেচা হত তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

যাই হোক, কালে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক কারণে, এই বর্ণাশ্রম ধর্ম জাতিভেদ প্রথায় রূপান্তরিত হল। ভারতের জাতিভেদ প্রথা প্রকৃতপক্ষে একটি অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাজন এবং পরবর্তীকালে এই প্রথা ইয়োরোপে গিল্ড (guild) ব্যবস্থা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। একই পেশা একই শিল্পকর্ম বা একই কুটীরশিল্প বছরের পর বছর ধরে বংশপরম্পরায় করতে করতে এই জাতি বা গিল্ড ব্যবস্থা জন্মলাভ করে। কলু, কামার, তাঁতী, কুমার, গোয়ালা ইত্যাদি এই গিল্ড ব্যবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মাত্র ১০০ বছর আগেও এই জাতি বা গিল্ড ব্যবস্থা অটুট ছিল। পরে যন্ত্রের আগমনে তা ভেঙে পড়তে শুরু করে। তা সত্ত্বেও এমন অনেক হস্তশিল্প ও কুটীরশিল্প আছে যেখানে আজও যন্ত্রের প্রবেশ ঘটেনি। সেই সব ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক গিল্ড ব্যবস্থা আজও তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

এই গিল্ড ব্যবস্থাকে অনুসরণ করেই শিক্ষাদীক্ষা, পঠন-পাঠন ও পুরোহিতের পেশার গিল্ড ব্রাহ্মণদের দখলে ছিল। ব্রাহ্মণরা যেমন তাদের গিল্ডে অন্য কাউকে ঢুকতে দিত না, তেমনি অন্য কোন গিল্ডেও ব্রাহ্মণদের প্রবেশাধিকার ছিল না। সব থেকে বড় কথা হল, বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্য সমাজ হিসাবে আজ একমাত্র হিন্দু সমাজই টিকে আছে। আর এ কথাও অনস্বীকার্য যে, একটা বাড়ী পুরানো হলেই তাতে নানা রকম আগাছা জন্মায়, দেয়াল জীর্ণ হয় বা পলেস্তারা খসে পড়ে। কাজেই প্রাচীন এই হিন্দু সমাজে যদি কোথাও কিছু আগাছা জন্মে থাকে তবে

সব হিন্দুর উচিত একযোগে হাত লাগিয়ে আগাছা পরিষ্কার করা, জীর্ণ বাড়ীর মেরামত করা। তাকে কুৎসা করা বা গালি দেওয়া নয়। সকল হিন্দুরই এটা খেয়াল রাখা উচিত যে, হিন্দু সংস্কৃতিকে থুতু দিলে প্রকারান্তরে তা নিজের গায়েই থুতু দেওয়া হয়।

শ্রীজয়ন্তানুজবাবু আর্যদের বর্বর বলেছেন, ব্রাহ্মণদের সমাজের পরগাছা এবং অত্যন্ত হীন দুষ্টচক্রী বলে গালাগালি করেছেন। অথচ তাঁর 'বন্দ্যোপাধ্যায়' উপাধি এটাই প্রমাণ করছে যে, তিনি আজও সেই বর্বর ও দুষ্টচক্রীদের ঐতিহ্যই বহন করে চলেছন। এই 'বন্দ্যোপাধ্যায়' পদবীর জন্য তিনি মনে মনে গর্ব অনুভব করেন কিনা, তা অবশ্য এই লেখকের জানা নেই।

এ ব্যাপারে আরও দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। জয়ন্তানুজবাবু সহ সব সাম্যবাদী বুদ্ধিজীবীরাই সর্বদা এই মত ব্যক্ত করে চলেছেন যে, হিন্দু ধর্ম খুবই জঘন্য কারণ এতে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী অত্যন্ত হীন জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান। সেই তুলনায় ইসলাম ও খ্রীস্টধর্ম খুবই উদার এবং মানবিক, কারণ তাতে জাতিভেদ প্রথা নেই। ভারতের মুসলীম সমাজে যে জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান তা আগেই বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু জাতিভেদ প্রথাও আলোচিত হয়েছে, যেখানে উচ্চ বর্ণের হিন্দুর দ্বারা নিম্নবর্ণের হিন্দুর তথাকথিত অত্যাচার ও শোষণ বিদ্যমান।

কিন্তু ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মের মধ্যে মানুষে মানুষে ভয়াবহ বিভেদ সৃষ্টিকারী যে সব নির্দেশ রয়েছে সে ব্যাপারে আমাদের এই বুদ্ধিজীবীর দল আশ্চর্যজনকভাবে নীরব কেন? হিন্দুর জাতিভেদ প্রথার মধ্যে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির প্রেরণা আছে মেনে নিলেও সেখানে কোথাও বলা হয়নি যে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের এবং যারা হিন্দু নয় তাদের কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হবে। হিন্দু পৃথিবীর সমস্ত মানব সমাজকেই নিজের আত্মীয় বলে স্বীকার করে; বলে বসুধৈব কুটুম্বকম্। হিন্দু বিশ্বের প্রতিটি মানুষকেই অমৃতের পুত্র বলে মনে করে। হিন্দু যখন বলে, "সর্বে সুখিনঃ সন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ", তখন সে কখনও বলে না যে, শুধুমাত্র হিন্দুই সুখী হোক, হিন্দুরই নিরাময় হোক। সে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যই সুখ ও নিরাময় কামনা করে।

পক্ষান্তরে ইসলাম ও খ্রীস্টধর্ম সমগ্র মানবজাতিকে বিশ্বাসী ও

অবিশ্বাসী এই দুই দলে ভাগ করে। ইসলামী মতে কোন অবিশ্বাসী কাফেরের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। আপাত কোন অন্যায় না করলেও কোন ব্যক্তি শুধু মুসলমান না হবার জন্যই কোরান মতে সে বধযোগ্য। এ ব্যাপারে কোরানের কিছু কিছু নির্দেশ এ বইয়ের 'লেখকের কথা' অধ্যায়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ইসলামের মূল বাণীই হল, সমস্ত অ-মুসলমানদের কেটে উজাড় করে পৃথিবী কাফেরশূন্য করা এবং বিশ্বব্যাপী আল্লার রাজত্ব কায়েম করা।

খ্রীস্টধর্মও প্রায় একই কথা বলে। এককালে ইহুদীরা মিশরে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করত এবং মুসা বা মোজেস তাদের সেখান থেকে উদ্ধার করে সিনাই মরুভূমিতে নিয়ে আসে। আজ যার নাম ইজরাইল, এক কালে সেই ভূখণ্ডের নাম ছিল ক্যানান (canaan)। গড তখন মোজেসকে বাণী পাঠালো, "এই ক্যানান আমি তোমাদের দান করলাম, তোমরা গিয়ে তা দখল কর" এবং আদেশ করলেন, ''When you cross the Jordan (river) into Canaan, drive out all the inhabitants from the land before you. Destroy all their carved images and their cast idols and demolish all their high places (temples). Take possession of the land and settle in it, for I have given you the land to possess.'' (Numbers-33:51-53)। গডের আদেশ অনুসারে মোজেস মিডিয়ান আক্রমণ করল ''They fought against the Midians, as the Lord commanded Moses, and killed every man....The Israelites captured the Midianite women and children and took all the Midianite herds, flocks and goods as plunder. They burned all the towns where the Midianite had settled.'' (ibid, 31:7-10)। গড তারপর আদেশ করলেন, ''Now kill all the boys. And kill every woman who has slept with a man, but save for yourselves every girl who has never slept with a man'' (ibid, 31:17)।

বাইবেলের গডের চরিত্র কি রকম? গড বলছেন, "আমি হলাম একজন হিংসুক গড" এবং ''If a man or woman living among you in one of the towns the Lord gives

you is found doing evil in the eyes of the Lord your God in violation of his covenant, and contrary to my command has worshipped other gods, bowing down to them or to the sun or the moon or the stars of the sky, and this has been brought to your attention then you must investigate it thoroughly. If it is true and it has been proved that this detestable thing has been done in Israel, take the man or woman who has done this evil deed to your city gate and stone that person to death'' (Deut. 17:2-5)।

ইতিমধ্যে মোজেসের মৃত্যু হয়েছে তাই ক্যানান জয় করার ভার পড়ল পরবর্তী পয়গম্বর (Prophet) জশুয়ার উপর। জশুয়া ও তার দলবল জর্ডন নদী অতিক্রম করে ক্যানানে প্রবেশ করল। গড ইতিমধ্যে নিয়ম করে দিলেন, জীবন্ত যা কিছু সব মেরে ফেলতে, অধিকৃত সমস্ত জিনিসপত্র পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং সোনা, রূপা, তামা, লোহা ইত্যাদি ধাতব জিনিসপত্র পুড়িয়ে শুদ্ধ করে গ্রহণ করতে। এর পর জশুয়ার নেতৃত্বে ইহুদীরা জেরিকো নগর দখল করল। বাইবেল বলছে, ''They devoted the city to the Lord and destroyed with the sword every living thing men and women, young and old, cattle, sheep and donkeys'' (Joshua : 6 : 21)....''Then they burned the whole city and everything in it, but they put the silver and gold, and the articles of bronze and iron into the treasury of the Lord's house ''(ibid. 6:24),

এইভাবে জেরিকো নগর দখল করার পর জশুয়া আই নগর দখল করতে চলল। When Israel had finished killing all the men of Ai in the fields and in the desert where they had chased them, and when every one of them had been put to the sword, all the Isaelites returned to Ai and killed those who were in it. Twelve thousand men and women fell that day all the people of Ai. For Joshua did draw back the hand that held out his javelin until he had destroyed all who lived in Ai.....So Joshna burnd

Ai and made it a permanent heap of ruins, a desolate place to this day'' (ibid-8:24-28)।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিধর্মী হত্যা, নির্বিচারে বিধর্মী নারী-শিশু হত্যা করে তাদের ধন সম্পদ আত্মসাৎ করাই বাইবেলের মূল কথা। আর বাইবেলের এই নির্দেশকে অনুসরণ করেই ইংরেজরা ও অন্যান্য ইয়োরোপীয়রা আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের আদিম অধিবাসীদের কেটে উজাড় করে তাদের ধন-সম্পদ, জায়গা জমি আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু দুঃখের কথা হল, বাইবেল ও কোরানের এই সব অমানবিক নির্দেশ আমাদের সাম্যবাদী ও সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের নজরে পড়ে না। শূদ্রদের উপর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কল্পিত অত্যাচার তাদের কাছে বর্বর ও অমানবিক মনে হয়, কিন্তু বাইবেল ও কোরানের বিধর্মী হত্যার এই সমস্ত নির্দেশ তাদের কাছে খুবই মানবিক বলে প্রতীয়মান হয়। তাই তাঁরা হিন্দু ধর্মকে অমানবিক আখ্যা দেন, আর খ্রীস্টধর্ম ও ইসলামকে মানবিক, উদার ও সাম্যবাদী আখ্যা দেন।

অনেকের মনে ধারণা থাকতে পারে যে, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টেই শুধু এই রকম হত্যা, রক্তপাত ও ঘৃণার তত্ত্ব রয়েছে, কিন্তু নিউ টেস্টামেন্টের বাণী অত্যন্ত মানবিক ও উদার। তাই নিউ টেস্টামেন্টের কিছু কিছু বাণী নীচে দেওয়া গেল—

"যে যীশুর শরণাপন্ন না হবে তার পরিত্রাণ নেই "(2 Timothy-3); "যে খ্রীস্টকে অনুসরণ করবে, একমাত্র সেই মুক্তি পাবে" (2 Peter-3/13); "অ-খ্রীস্টানদের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ষিত হবে" (Hebrews-3:11) "অ-খ্রীস্টানরা হল বন্য পশু" (2 peter-2:12); "অ-খ্রীস্টানদের ঘরে ঢুকতে দিও না।" (2 John-10); "অ-খ্রীস্টান বিধর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না" (2 Corinthian-6:14); "ওদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করো না" (3 John-7); অ-খ্রীস্টানরা হল ঈশ্বরহীন পশু" (Jude-4); খ্রীস্টকে অনুসরণকারীরা হল ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র বা elect'' (Colossians-3:12; Peter-1:1; 2:9, 2:18, Thessalonians-1:4; Titus- 1:1ইত্যাদি) এবং "অ-খ্রীস্টানরা সকলেই নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে" (3 Thessalonians-1:8)। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, বাইবেল ও কোরানের এইসব অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক এবং মানুষে মানুষে বিভেদ

সৃষ্টিকারী এইসব ঘৃণার তত্ত্ব জয়ন্তানুজবাবু সহ সমস্ত সাম্যবাদী ও সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের বিচারে অত্যন্ত মানবিক ও উদার। পক্ষান্তরে যেই হিন্দু ধর্ম পৃথিবীর সকল মানবকে অমৃতের পুত্র বলে সম্বোধন করে এবং যেই হিন্দু ধর্মের ঈশ্বর বলেন, "সকল মানুষই আমার কাছে সমান, কেউ আমার প্রিয়পাত্রও নয়, আবার কেউ আমার বিদ্বেষভাজনও নয়" (গীতা-৯:২৯), সেই হিন্দু ধর্ম তাঁদের বিচারে অত্যন্ত হীন, অমানবিক ও বর্বর।

এখানে আরও একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হল, জয়ন্তানুজবাবুর মত সেই সব বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীর দল, যাঁরা দিনরাত হিন্দু ধর্মকে অমানবিক ও বর্বর বলে গালি দিয়ে চলেছেন, তাঁরাও পচাগলা এই হিন্দু ধর্মকেই আঁকড়ে পড়ে আছেন। কেন তাঁরা অত্যন্ত মানবিক, উদার ও সাম্যবাদী খ্রীস্টধর্ম বা ইসলাম গ্রহণ করে ক্রীস্টান বা মুসলমান হচ্ছেন না তা দুর্বোধ্য। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলার আছে। হিন্দু ধর্ম অনুদার, বর্বর ও অমানবিক বলেই জয়ন্তানুজবাবুর মত লোকেরা "সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্‌গীতা"-র মত গ্রন্থ লিখে গীতাকে গালি দিয়ে বহাল তবিয়তে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন। পক্ষান্তরে 'সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোরান" বলে ঐরকম কোন গ্রন্থ রচনা করলে সাম্যবাদী, মানবিক ও উদার ইসলাম ধর্মের লোকেরা এতদিনে ধড় থেকে তাঁর মুণ্ডখানা নামিয়ে দিত।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, জাতিভেদ প্রথার নিন্দা করা এবং শূদ্রদের জন্য এইসব বুদ্ধিজীবীদের চোখের জল ফেলা দুর্জনের ছল মাত্র। এদের মূল উদ্দেশ্য হল মার্কসীয় সাম্যবাদ বা নেহরুমার্কা সেকুলারবাদের জয়গান করা, এবং সেই কারণে হিন্দু ধর্মকে হীন প্রমাণিত করে এবং ইসলামের জয়গান করে মুসলীম তোষণের রাজনৈতিক লাইনকে শক্তিশালী করা। কারণ এই পথেই উচ্ছিষ্টের সম্ভাবনা আছে।

এই মুসলীম তোষণের অঙ্গ হিসাবেই এইসব বুদ্ধিজীবী বা দুর্বুদ্ধিজীবীরা দিনরাত আরও একটা মিথ্যা প্রচার করে চলেছেন। তাঁরা প্রচার করে চলেছেন যে, বিদেশী মুসলমান আক্রমণকারীরা এদেশে এসে কোন হিন্দুকে বলপূর্বক মুসলমান করেনি। পক্ষান্তরে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এবং ইসলামের সাম্যবাদী ও মানবিক

আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা দলে দলে মুসলমান হয়েছে।

ইতিহাস কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। নবী মহম্মদের মক্কাবাস কালে আরবের অল্প কিছু সংখ্যক লোকই স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়েছিল। এছাড়া আবুবকর কতিপয় ক্রীতদাসকে পয়সা দিয়ে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন। কিন্তু মদিনায় হিজরৎ করার পর পুরো চিত্রটাই বদলে গেল। মক্কায় যিনি ছিলেন সামান্য একজন ধর্ম প্রচারক, মদিনায় এসে তিনি হয়ে বসলেন একাধারে মদিনার শাসক, সৈন্যাধ্যক্ষ ও প্রধান বিচারক। তখন থেকেই জিহাদ বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করার নীতি গৃহীত হল। সেই সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইসলাম তরবারির সাহায্যেই প্রসার লাভ করেছে। মুসলমানরা যখন মিশর, ইরাক, ইরান, তুরস্ক, আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশ জয় করল তখন সেখানকার অধিবাসীদের সামনে মাত্র দুটো রাস্তাই খোলা ছিল, হয় ইসলাম গ্রহণ, নয় মৃত্যু। কাজেই প্রাণের ভয়েই সেই সব দেশের লোকেরা মুসলমান হয়েছিল। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানকার আজকের ধর্মান্তরিত মুসলমানরা প্রাণের ভয়েই এককালে মুসলমান হয়েছেন, সেটাই ঐতিহাসিক সত্য।

এ প্রসঙ্গে একটা গল্প বলা চলতে পারে। আমেরিকার ওয়াশিংটন শহর থেকে The India Times নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকার ১৯৯১ সালের ৩১শে মে সংখ্যায় নাজির আলি নামে আমেরিকায় প্রবাসী একজন ভারতীয় মুসলমানের একটি পত্র প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রে শ্রীনাজির আলি জানান যে, দিল্লীর মেহেরৌলী অঞ্চলে তাঁর বাড়ী এবং তাঁর বৃদ্ধ পিতামহ সেখানেই বাস করেন। সেই বছর নাজির আলির আমন্ত্রণে সেই বৃদ্ধ আমেরিকায় বেড়াতে আসেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা নাজির আলি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা ঠাকুর্দা, আমরা তো মুসলমান। তবে অন্যান্য মুসলমানের মত শালোয়ার কামিজ না পরে আমরা ধুতি পরি কেন?

প্রশ্ন শুনে সেই বৃদ্ধ হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করেন। তাঁর কান্না থামানো মুশকিল হয়ে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ পরে শান্ত হয়ে বৃদ্ধ বলতে থাকেন, "সেই দুঃখের কথা তোমাকে আর কি বলব বাবা, আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগে আমরা ছিলাম একটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবার। তখন একদিন গলায় তরবারি ঠেকিয়ে (at the sword

point) আমাদের মুসলমান করা হয়। সেই দিনই আমাদের পরিবারের কর্তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, "বাপ-ঠাকুর্দার বৈদিক সংস্কৃতি আমরা ছাড়ব না। আমরা ধুতি পরা ছাড়বো না এবং এই ধুতি পরার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের গৌরবময় অতীতকে বহন ও স্মরণ করতে থাকবো।" এই হল আমাদের ধুতি পরার কাহিনী।"

বৃদ্ধ আরও বললেন যে, তাঁদের গৃহদেবতা ছিলেন বীর হনুমান। নাজির আলির পূর্বপুরুষরা এও ঠিক করলেন যে, সেই হনুমান বিগ্রহ যেখানে যেমন আছে তেমনই থাকবে, শুধু মন্দিরের দরজা তালাবন্ধ রাখা হবে। ভবিষ্যতে অনুকূল পরিস্থিতিতে আবার মন্দিরের দরজা খোলা হবে।

উপরিউক্ত ঘটনা একটা নমুনা মাত্র। ভারতবর্ষের ধর্মান্তরিত মুসলমানদের অতীত ইতিহাস খুঁজলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই যে এ রকম ঘটনা পাওয়া যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে মুসলমান করা হয়েছে বলেই আজও নাজির আলিদের মত অনেক মুসলমান পরিবারই তাঁদের হিন্দু অতীতকে নানাভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করে থাকেন। অনেকেই তাঁদের পুরানো হিন্দু পদবী ব্যবহার করেন। মেয়েরা শাঁখা সিঁদুর পরেন। কোরানের সঙ্গে ছোট্ট একখানা গীতা এক সঙ্গে বেঁধে রাখেন। বিয়ের সময় হিন্দু পঞ্জিকা দেখে শুভদিন নির্ধারণ করেন। নিমন্ত্রণ পত্রে প্রজাপতি বা সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি ব্যবহার করেন এবং ইসলামী প্রথায় নিকা হয়ে যাবার পর ব্রাহ্মণ পুরুত ডেকে মন্ত্র পড়ে সেই বিয়েকে পবিত্র করেন ইত্যাদি।

আমাদের বুদ্ধিজীবীদের আরেকটি সিদ্ধান্ত হল, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে মুসলমান হয়েছে। তাঁদের এই সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত এবং হিন্দু সংস্কৃতির উপর কালিমা লেপন করার জন্যই তাঁরা এই মিথ্যা প্রচার করে চলেছন। যদি তাই হবে, তবে ইরান, ইরাক, মিশর প্রভৃতি দেশগুলোতে ১০০ শতাংশ ইসলামীকরণ সম্ভব হল কেমন করে? ঐ সব দেশে ঘৃণ্য জাতিভেদ প্রথাও ছিল না এবং উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের উপর নির্যাতনও ছিল না। পক্ষান্তরে হিন্দু সমাজে ঘৃণ্য জাতিভেদ প্রথা এবং নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের তথাকথিত অমানবিক নির্যাতন সত্ত্বেও মুসলমান শাসকদের পক্ষে ৮০০ বছর রাজত্ব করেও ১১ শতাংশের বেশী হিন্দুকে মুসলমান করা সম্ভব

হল না কেন? কেন সেই সব নির্যাতিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা প্রাণ দিল, তবুও ধর্মত্যাগ করল না? কেন মুসলমানদের হাতে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেও করাচির ধাঙড়-মেথররা ধর্ম ত্যাগ না করে আজও হিন্দু হিসাবে টিকে থাকতে পারল? এই সব প্রশ্নের জবাব আমাদের দেশদ্রোহী সাম্যবাদী ও সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের কাছে নেই।

এ ব্যাপারে আরও একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তখনকার মুসলমান শাসকরা দিল্লীকে কেন্দ্র করেই ভারত শাসন করেছিল। তাই দিল্লী ও তার আশে পাশেই ধর্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা অধিক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না হয়ে দিল্লী থেকে অনেক দূরে, বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য হল কেন? পাকিস্তানের ক্ষেত্রে কারণ দেখানো চলে যে, মুসলমান আক্রমণকারীরা পশ্চিম সীমান্ত ও খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতে ঢুকত। সেই কারণে ঐ অঞ্চলের লোকেরা মুসলমানদের দ্বারা সর্বাধিক অত্যাচারিত হত। ফলে সেখানে মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যায়। কিন্তু পূর্ব বাংলায় মুসলমানের সংখ্যাধিক্য হল কেন?

এর একমাত্র কারণ হল, পূর্ব বাংলার তৎকালীন বৌদ্ধদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণ। ভারতের অন্যান্য জায়গায় যখন বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তখনও পাল রাজাদের দাক্ষিণ্যে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম টিকে ছিল। শুধু তাই নয়, সেই সময় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বৌদ্ধরাও বাংলায় এসে বসবাস করতে শুরু করে। মুসলমানরা বাংলা দখল করলে এই বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলতে পারে যে, ৭১১ সালে মহম্মদ বিন কাসেম সিন্ধুদেশ দখল করলে সেখানকার বৌদ্ধরাও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে এবং আক্রমণকারীদের নানাভাবে সাহায্য করে। এখানে যেটা লক্ষ্য করার বিষয় তা হল, বৌদ্ধ ধর্মে জাতিভেদ প্রথাও নেই এবং উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের উপর তথাকথিত নির্যাতনও অনুপস্থিত।

বৌদ্ধরা মুসলমান হবার ফলেই যে বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যায় তার আরও কয়েকটা প্রমাণ আছে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ছিল মুণ্ডিতমস্তক। সেই মস্তকমুণ্ডিত সন্ন্যাসীরা মুসলমান হবার পর 'নেড়ে' নামে অভিহিত হতে থাকে। সেই থেকে বাংলায় মুসলমানদের আরেক

নাম হয় নেড়ে। বাংলার বৌদ্ধরা তখন লুঙ্গী পরতো। ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধদের মধ্যে লুঙ্গী পরার চল আজও বিদ্যমান। বৌদ্ধরা মুসলমান হলে লুঙ্গী একটি মুসলীম পরিধানে পর্যবসিত হয়।

কি করে এই জাতিভেদ প্রথা ১০০ শতাংশ ইসলামীকরণের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করল? এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, হিন্দুর এই জাতিবিভাগের সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে ব্রাহ্মণরা। কিন্তু সর্বনিম্ন স্থানে কার অবস্থান তা নির্ণয় করা এক দুঃসাধ্য কাজ। তাই সুদীর্ঘ এই জাতি-বিভাগের শিকলের যেখানেই যার অবস্থান হোক না কেন, তার মনে এই গর্ব বিদ্যমান যে আরও অনেকের থেকে উচ্চ স্থানে তার অবস্থান। এই গর্ব বা অহঙ্কারই হিন্দুকে মুসলমান হতে বাধা দিয়েছে, কারণ মুসলমান হলে এই গর্বের অবসান হবে। (এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের 'পুরুষার্থ প্রসঙ্গ ঃ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা' দ্রষ্টব্য)।

এই সব বুদ্ধিজীবীরা আরও একটি সর্বৈব মিথ্যা প্রচার করে চলেছেন তা হল, ইসলামের সাম্যবাদী ও উদার ভ্রাতৃত্বের আহ্বানে সাড়া দিয়েও অনেক হিন্দু মুসলমান হয়েছিল। এ ব্যাপারে আলবেরুনীই সত্য কথা বলে গিয়েছেন যা আগেই বলা হয়েছে (পৃঃ ৫৬)। ভারতের হিন্দুরা মুসলমানদের সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করতো এবং তাদের ম্লেচ্ছ বলে ডাকত। মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেকার হানাহানি, রক্তপাত, বিশ্বাসঘাতকতা, লাম্পট্য ও নিকট আত্মীয় সম্বন্ধের মধ্যে বিয়েসাদীকে হিন্দুরা অন্তর থেকে ঘৃণা করতো। কাজেই ইসলামের সাম্যবাদী ভ্রাতৃত্বের নীতি হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে, এর মত ডাহা মিথ্যা কথা আর কিছু নেই। হিন্দুরা আরবের পশুপালক বর্বর ইসলামী সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতো বলেই ভারতবর্ষের হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষা পেয়েছে।

বিষয়-সূচী